দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

নোয়াখালি থেকে সন্দেশখালি
আর কতদিন চলবে?
— পৃঃ ১১

সন্দেশখালি কাণ্ডের নেপথ্যে
শাসকদলের সন্ত্রাসীরা
— পৃঃ ১৭

৭৬ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা।। ৪ মার্চ, ২০২৪।। ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

সন্ত্রাসখালি সন্দেশখালি

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৪ মার্চ - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

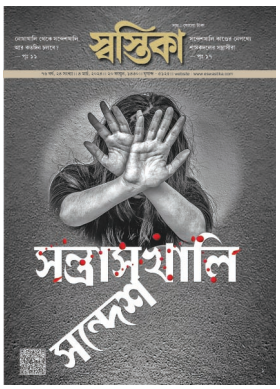

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সন্দেশখালির ভেরি বাঁধে আটকে মমতা-অভিষেক-পুলিশ 'আহা হাল্লা চলেছে যুদ্ধে' □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

সন্দেশখালি তৃণমূলের চোরাবালি □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

চীনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ভারতের □ বিজয় গোখলে □ ৮

টিভি নাইন নেটওয়ার্কের বার্ষিক কনক্লেভ, আজ ভারত যা ভাবে...

□ বিশ্বামিত্র □ ১০

নোয়াখালি থেকে সন্দেশখালি আর কতদিন চলবে?

□ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১১

সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্যের মহিলাদের চোখ খুলেছে

□ আনন্দ মোহন দাস □ ১৪

সন্দেশখালি কাণ্ডের নেপথ্যে শাসকদলের মস্তিষ্ক

□ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ১৭

রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে তৃণমূলের মৃত্যুঘণ্টা বাজালো সন্দেশখালি □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ২৩

সন্দেশখালিতে চলছে বিচ্ছিন্নতাবাদের তৃতীয় ধাপ

□ দীপ্তাস্য যশ □ ২৪

আপন সাধনায় ব্যক্তিই হলো 'পরম' পুরুষ

□ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাতৃসাধনা

□ সুতপা বসাক ভড় □ ৩৪

সন্দেশখালি প্রমাণ করল পশ্চিমবঙ্গে মধ্যযুগীয় বর্বতাই চলছে

□ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ৩৫

রামলালার শ্যামল অঙ্গে অরুণোজ্জ্বল রত্নালংকার

□ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৪৩

সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত

□ দিগন্ত চক্রবর্তী □ ৪৬

জ্বলছে সন্দেশখালি, রাজ্য থেকে পালাবার ছক কষছে কি তৃণমূল কংগ্রেস?

□ জাহ্নবী রায় □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৭ □ রঙ্গম : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

প্রকাশিত হবে ১১ মার্চ, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১১ মার্চ, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শিবরাত্রি

মহাদেব শিব ভারত সংস্কৃতির প্রতীক। তাঁকে যোগ, ধ্যান, চিকিৎসা, নৃত্য, কৃষিবিদ্যা ও শিল্পকলার স্রষ্টা বলা হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মধ্যযুগীয় শাসন !

ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামি শাসন ভারতবর্ষের বুকে অন্ধকারময় যুগের সূচনা করিয়াছিল। নির্বিচার নরহত্যা, লুণ্ঠন, নারীর সম্ভ্রমহানি, শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু মঠ-মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জীবনকে তাহারা বিপর্যস্ত করিয়াছিল। দীর্ঘ আটশত বৎসর এই বর্বরতা চলিয়াছিল। তাহার মধ্যেই তাহারা এই দেশের বহু মানুষকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। ধর্মান্তরিতরাও তাহাদের পূর্বের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ভুলিয়া গিয়া বহিরাগত আক্রমণকারীদেরই তাহাদের পূর্বপুরুষ মনে করিয়া এক সময়ের জ্ঞাতিবর্গের বিরুদ্ধেই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত হইয়াছে। দেশমাতৃকার বিভাজন পর্যন্ত তাহারা করিয়াছে। বাঙ্গালি জাতির দুর্ভাগ্য যে এর বিষময় ফল তাহাদের ভোগ করিতে হইয়াছে। পরাধীনতার কালে যেইভাবে তাহাদের বিধর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে, স্বাধীনোত্তর কালেও একইভাবে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে। আরও দুর্ভাগ্যের হইল, সন্ত্রাসীরা বরাবরই শাসক দলেরই মদতপুষ্ট। দীর্ঘ বাম শাসনে এই অত্যাচার বাঙ্গালিকে ভোগ করিতে হইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামি শাসনের ন্যায়ই অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ভোটভিখারি শাসক, তাহাদের প্রসাদপুষ্ট বুদ্ধিজীবী ও অনুপ্রাণিত সাংবাদিককুল নীরব থাকিয়াছেন। এক সময় রাজ্যে শাসন ক্ষমতার পালাবদল হইয়াছে কিন্তু মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বরং তাহা শতগুণে বর্ধিত হইয়া বাঙ্গালির জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আজ বাঙ্গালি রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সন্দেশখালিতে আজ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হইয়াছে। সমগ্র দেশ জানিতে পারিয়াছে সন্দেশখালিতে সেই মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাই চলিতেছে এবং তাহা রাজ্যের শাসকদলের নেতৃত্বেই। পশ্চিমবঙ্গ যেন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য নহে, পৃথক কোনো একটি দেশ। রাজ্য সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কোনোরূপ পরোয়া করিতেছে না। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা দুর্নীতির তদন্ত করিতে যাইয়াও আক্রান্ত হন শাসকদলের সন্ত্রাসীবাহিনীর হাতে। সন্দেশখালির অত্যাচারিত মানুষেরা জানাইয়াছেন কীভাবে তাহাদের জমিজায়গা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, কীভাবে তাহাদের ঘরের মা-বোনেদের যৌন শোষণ করা হইয়াছে। অত্যাচার কত নির্মম হইলে কোনো নারী তাহার যৌন শোষণের কথা সংবাদমাধ্যমে বলিতে পারেন, বিচারকের সম্মুখে জবানবন্দি দিতে পারেন তাহা সহজেই অনুমেয়। সন্দেশখালির মাতা-ভগিনীদের আর হারাইবার কিছু নাই, তাই তাহারা পথে নামিয়াছেন, প্রতিকার চাহিতেছেন। রাজ্যের শাসকদল আর কোথায় কোথায় মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছে, তাহাও ক্রমশ প্রকাশ্যে আসিতেছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হইয়াও সন্দেশখালির ঘটনায় নীরব রহিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তথাকার দরিদ্র মানুষের জমিজমা কাড়িয়া লইবার এবং মহিলাদের সম্ভ্রমহানির সংবাদ যাহাতে প্রকাশ না হইয়া পড়ে তাহার জন্য তিনি তাঁহার পুলিশবাহিনীকে নির্দেশ দিয়াছেন। পুলিশ আধিকারিকরা মানুষের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তারের হুমকি দিতেছেন। একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শত শত মাতা-ভগিনী শাসকদলের দীর্ঘ বারো বৎসরের অত্যাচারের প্রতিকার চাহিয়া বিক্ষোভে শামিল হইয়াছেন। রাজ্য সরকারের পুলিশ চুনোপুঁটি দুই-একজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া মূল সন্ত্রাসীকে আড়ালে রাখিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ নাকি তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। আরও দুর্ভাগ্যের হইল, এই রাজ্য সরকারের উচ্ছিষ্টভোগী বুদ্ধিজীবী যাঁহারা অন্য রাজ্যে পান হইতে চুন খসিলেই নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া মোমবাতি হাতে করিয়া রাজপথে নামিয়া পড়িতেন, পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দিনে তাঁহারা কোথায় যেন আত্মগোপন করিয়াছেন। বামনেতৃবর্গ এবং তাহাদের তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীরাও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার অবশ্য কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, সন্দেশখালি-সহ রাজ্যে যে মধ্যযুগীয় সন্ত্রাস চলিতেছে, তাহা তাহাদেরই আমদানিকৃত। দ্বিতীয়ত, অধুনা তাহারা কেন্দ্র বিরোধী জোটের শরিক হইয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদতলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশ অথবা মোগলিস্তান করিবার দায়িত্ব তো তাহারা তাহাদের সেরা ছাত্রীর হস্তেই অর্পণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে যাহা চলিতেছে, তাহা বাঙ্গালির লজ্জা, জাতির লজ্জা, সমগ্র দেশের লজ্জা। এই লজ্জা হইতে পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক সন্দেশখালি। সন্দেশখালির আগুনেই মধযুগীয় শাসনের অবসান হউক।

সুভাষিতম্

বুধাগ্রে ন গুণান্ ব্রূয়াৎ সাধু বেত্তি যতঃ স্বয়ম্।
মূর্খাগ্রেপি চ ন ব্রূয়াৎ বুধপ্রোক্তং ন বেত্তি সঃ।।

জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে নিজের গুণ বর্ণনা করতে নেই, কেননা তিনি নিজেই তা বুঝতে পারেন। মূর্খের সামনেও নিজের গুণকীর্তন করতে নেই, কেননা সে কিছুই বুঝতে পারবে না।

সন্দেশখালির ভেড়ি বাঁধে আটকে মমতা-অভিষেক-পুলিশ

‘আহা হাল্লা চলেছে যুদ্ধে’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মনে হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘যুদ্ধু যুদ্ধু’ খেলার শেষ হতে চলেছে। সন্দেশখালির মা-বোনেদের প্রতিবাদ রাজ্যের মানুষের মন থেকে তৃণমূল-ভূত সরিয়ে দিয়েছে। হাওড়া আর দিনহাটাতেও প্রতিবাদ দেখা গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে রাজ্য জুড়ে আরও প্রতিবাদের সুনামি দেখা দিলে অবাক হব না। আসন্ন লোকসভা ভোটে বিজেপি রাজ্যে তৃণমূলকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দেবে। তৃণমূলের এক সময়ের উপদেষ্টা তা জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন। কিছু সমীক্ষা বলছে বিজেপি তৃণমূলের থেকে ১০ শতাংশ (৪২ শতাংশ) ভোট বেশি পেতে পারে সেই সঙ্গে ২০১৯ এর চেয়ে ৮-১০টি বেশি আসন। কারও ধারণা তৃণমূল তার গড় রক্ষা করবে। ২০২১ এর বিধানসভা ভোটের পর ওই উপদেষ্টা দাবি করেছিলেন বিজেপি রাজ্যে থাকতে এসেছে চলে যেতে নয়।

তাঁর মতে পূর্ব আর দক্ষিণের ২২০টি আসনের মধ্যে বিজেপি আগের তুলনায় অনেক ভালো ফল করবে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন পাঁচ বছরের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলেই আমার মনে হয়েছে। কারণ বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল মনে মনে ধরে নিয়েছে বিজেপি পুনরায় বিপুলভাবে ক্ষমতায় আসতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। জল মাপতে দিশেহারা তৃণমূল ১০ মার্চ সভা ডেকেছে। তাতে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। সিপিএম চালিত বিদেশি বামফ্রন্টের শেষ ব্রিগেড সমাবেশ দেখে যেমন তাদের পতন আন্দাজ করা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গ এখন হাল্লা রাজার দেশ। নাম মুন্ডি। অর্থাৎ ‘মমতার মণ্ডপ চণ্ডী’। জনৈক পাঠক চিঠি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কম ব্যবহার করতে কারণ তা বিরক্তিকর। দুর্নীতিপরায়ণ মুখ্যমন্ত্রীকে অবজ্ঞা করা উচিত আর কীসে রাজ্যের ভালো হয় সেটা লেখাই প্রয়োজন। পায়ের ঘা না শুকিয়ে পাঁচী হাঁটতে পারবে তো? জানতে পেরেছি ঘরের কোঁদলে সন্দেশখালির ভেড়ি বাঁধে আটকে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী আর সাংসদ ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে জুড়ে গিয়েছেন কিছু উচ্চপদস্থ পুলিশ আমলা। তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটি জামিনে রয়েছেন। রাজ্যের সমস্ত ভালো-মন্দ বিসর্জন দিয়ে তারা মেতে রয়েছেন এক ফেরার মাফিয়াকে পাকড়াও করতে। তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দড়ি টানাটানির খেলাও চলছে। এই সুযোগে তিনজনকেই নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে ওই মাফিয়া। তার গ্রেপ্তার নিয়ে আদালতের একটি স্থগিতাদেশ রয়েছে বলে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। আদালত জানিয়েছে কোনো প্রকার স্থগিতাদেশ নেই।

অভিষেক দলকে নতুনভাবে সাজাতে চান। বৃদ্ধতন্ত্র খতম করতে চান। তাতে ওই পুরোনো মাফিয়া কাটা পড়ে গেলে অসুবিধা নেই। দলের অন্দরে শুনেছি কয়েকজন তরুণ পুলিশ অফিসার অভিষেকের পাশে রয়েছে। তাতেই গোলোযোগ বেধেছে। অভিষেক জোরের সঙ্গে জানিয়েছে মাফিয়া ধরা পড়বে। মনে হয় ১০ মার্চের আগেই তা হবে। কানাঘুঁষো শুনেছি মাফিয়াকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সে তা প্রত্যাখ্যান করে। আদালতকে সে আগেই জানিয়েছিল আত্মসমর্পণে সে রাজি তবে গ্রেপ্তার করা যাবে না। এ ধরনের অন্যায় আবদার কেবল তার মতো তৃণমূলের নেতারাই করতে পারে। সূত্র বলছে, পুলিশ তাকে হাতে পেলে হয়তো ‘এনকাউন্টার’ করে দিতে পারে। মুখ বন্ধ করতে পুলিশের ভিতর কিছু আমলা তাকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চায়। তার বিরুদ্ধে ইডিকে আক্রমণের অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ হাতে পেলেই ইডি তাকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি নিয়ে চলে যাবে আর জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে তুলে দেবে। এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে।

কোঁদলের কাদার উপর থেকে নজর ঘোরাতে দু’জন সাংবাদিককে ফাঁসানো হয়েছে। একটি ক্ষেত্রে আদালত পুলিশকে পোড়ামুখো বাঁদর বানিয়ে ভৎর্সনা করেছে। অন্যজনের ক্ষেত্রেও সেটাই হবে। রাজ্যের মানুষ ইতিমধ্যেই হাজার ভূতের রাজার দয়া পেয়ে গিয়েছেন। তাতে মেছো ভেড়ির মাফিয়া জট যেমন কাটবে তেমনই সদা যুদ্ধরত হাল্লা রানির পতন অনিবার্য হয়ে পড়বে। সন্দেশখালির প্রতিবাদিনীরা এ রাজ্যের বোবাদের মুখে কথা ফুটিয়েছে। তাই হাল্লা রানির মিথ্যা ঢাক চুপসে যাবে আর তার মন্ত্রীদের মানুষকে বোকা বানানোর ষড়যন্ত্রেরও শেষ হবে। ■

সন্দেশখালির প্রতিবাদিনীরা এ রাজ্যের বোবাদের মুখে কথা ফুটিয়েছে। তাই হাল্লা রানির মিথ্যা ঢাক চুপসে যাবে আর তার মন্ত্রীদের মানুষকে বোকা বানানোর ষড়যন্ত্রেরও শেষ হবে।

সন্দেশখালি
তৃণমূলের চোরাবালি

ক্ষমতাবতীষু দিদি,

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ। কেন জানি না দিদি, আমার এই প্রবাদটা ইদানীং বড়োই মনে পড়ছে। মাঝে মাঝেই আমি আপনার জায়গায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আর বিজেপি নেতাদের জায়গায় আপনাকে বসিয়ে ফেলছি। অপরাধ নেবেন না দিদি, বড়োই তুলনায় চলে যাচ্ছি। ভুলেই যাচ্ছি যে, টানা তিনবার ক্ষমতায় রয়েছেন আপনি। আজ যে আচরণ করছেন সেটা তো পশ্চিমবঙ্গের শাসকের আচরণ। কংগ্রেস, সিপিএম যা করেছে সেটাই তো করে চলেছেন আপনি।

আপনি যখন প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন, তখন রাজ্যের কোনও জায়গায় কিছু ঘটলে আপনি কী করতেন দিদি? কোনও অঘটনকে কেন্দ্র করে সরকার বা শাসক দলের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এলেই আপনি সময় নষ্ট না করে সেখানে চলে যেতেন এবং অনুগামীদের নিয়ে শাসকের বিরোধিতায় সরব হতেন। যে কোনও অশান্ত অকুস্থলে আপনার সশরীর অভিযান ছিল চেনা রাজনীতি। এটা হওয়াও উচিত। কারণ, বিরোধী নেত্রীর কাছেই তো মানুষ শাসকের অন্যায়ের নালিশ জানাবে। এটাই তো চিরকালের নিয়ম। এখন কেন্দ্রে এমন একটা সরকার যে তার বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ নেই। আর থাকলেও সরকারকে জানালেই কাজ হয়ে যায়। এটা মানতেই হবে। তাছাড়া জাতীয় স্তরে বিরোধী বলে তো কিছুই অবশিষ্ট নেই। যেটুকু জোট ছিল তা ভেঙে দেওয়ার জন্য আবার আপনি একাই যথেষ্ট। আসলে কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলার ক্ষমতাটাই আপনার নেই। তাই আপনার বন্ধু বদলাতে থাকে নিয়মিত। আসল বন্ধু কে তা আপনিও জানেন না। আবার আপনাকেও মানে আপনার দলকে কেউ স্থায়ী বন্ধু হিসেবেও ভাবে না। সবটাই স্বার্থের সম্পর্ক। স্বার্থ মিটে গেলে বা না মিটলেই শেষ।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার বয়স বারো বছর হয়ে গিয়েছে। আপনার সরকার, প্রশাসন ও পুলিশ এখন যে ভাবে অশান্ত সন্দেশখালি ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরোধীদের গতিপথ রোধ করতে লাঠিসোটা নিয়ে বদ্ধপরিকর, তা দেখলে এক যুগ আগেকার আপনি কী বলতেন, সেটা আদৌ কঠিন প্রশ্ন নয়। আপনি বলবেন, বিরোধী বা প্রতিবাদীরা সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উত্তেজনাপ্রবণ এলাকায় যাচ্ছেন। আর পুলিশ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার মৌলিক দায়িত্ব পালনের জন্যই সব কিছু করছে। এটাই তো রাজধর্ম। এটাই তো বুদ্ধবাবুর প্রশাসনও করেছিল। দিদি, আপনার সঙ্গে বামেদের কোনও ফারাক নেই!

প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের নামে প্রতিবাদী কণ্ঠ দমন করার এই কথা নতুন কিছু নয়। বামফ্রন্টের সময়েও এই কুযুক্তি শোনা যেত। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। আপনার অভিযোগের সেই সব কথা অনেকটাই গল্প ছিল। সেই যে শিশুদের পা চিরে হলদি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। এখন আপনি সবাইকে বহিরাগত বলছেন। কিন্তু দিদি, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে তো আপনি ভূমিকন্যা ছিলেন না। আপনিও কি তখন বহিরাগত ছিলেন? না দিদি, আমি সেটা মনে করি না। ভারতের কোনও জায়গায়, এখন কাশ্মীরেও কোনও ভারতীয় বহিরাগত হতে পারেন না। এটাই ভারতের আইন। কিন্তু আপনার পছন্দের কেউ না হলেই তিনি বহিরাগত হতে পারেন না। এটাই ভারতের আইন। কিন্তু আপনার পছন্দের কেউ না হলেই তিনি বহিরাগত হতে পারেন না। এটাই ভারতের আইন। কিন্তু আপনার পছন্দের কেউ না হলেই তিনি বহিরাগত হয়ে যান। অনেক সময়ে সেটা দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলে তো কথাই নেই। কিন্তু দিদি, এই বাংলার লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান। আজ তাঁদের সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলের রাজ্য বহিরাগত ভাবে তা হলে কী হবে? ভেবে দেখেছে কখনও?

আপনার পছন্দের কেউ না হলেই তিনি বহিরাগত হয়ে যান। অনেক সময়ে সেটা দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হলে তো কথাই নেই। কিন্তু দিদি, এই বাংলার লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান। আজ তাঁদের সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলের রাজ্য বহিরাগত ভাবে তা হলে কী হবে? ভেবে দেখেছে কখনও?

অশান্তির প্রথম পর্বে গোটা সন্দেশখালি এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করার যে নির্দেশ দিয়েছিল আপনার প্রশাসন, তা কোর্ট পত্রপাঠ খারিজ করে দেয়। পরবর্তী অধ্যায়েও বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের অভিযান আটকানোর জন্য পুলিশের অতি- তৎপরতার প্রতিকারে আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাজধর্মের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করে প্রশাসনকে সেই ধর্ম পালনে বাধ্য করাই যেন কাজ হয়ে গিয়েছে।

বিরোধীদের গতি ও কণ্ঠ রোধ করাই কি শাসকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে? এতে কি গণতন্ত্র লাঞ্ছিত হয় না? এই রাজ্যে অবশ্য সেই লাঞ্ছনার মাত্রা অনেক দিনই চরম আকার নিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তো বিভিন্ন এলাকায় বহু নাগরিককে ভোট দিতে দেওয়া হয় না। প্রশাসনের প্রতি যে রাগ ও ক্ষোভ গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সন্দেশখালিতে দেখা যাচ্ছে, তার পিছনে এই ধারাবাহিক অধিকার-হরণের নিহিত ভূমিকা রয়েছে। আর সেটা কিন্তু সন্দেশখালির মতো গোটা রাজ্যেই। আজ পিছু হঠতে হচ্ছে আপনাকে। আমি চাই না রাজ্যের কোথাও এমন করে আমার দিদিকে পিছু হঠতে হয়। কিন্তু দিদি, ভয় যে মোটেও কাটছে না। ভোট যে এগিয়ে এল। □

অতিথি কলম

বিজয় গোখলে

চীনের প্রতি সতর্ক নজর ভারতের

লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এলএসি) বা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর জবরদস্তি এলাকা দখলের লক্ষ্যে চীনের আক্রমণাত্মক চেহারার মোকাবিলা এবং চীনা আচরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারত সরকার দেশের সীমানা রক্ষায় তার নীতি ও সংকল্পের পরিচয় প্রদর্শন করেছে।

২০২৪ সালের মাঝামাঝি পঞ্চবার্ষিক নির্বাচনী চক্র শেষ হলে কেন্দ্র সরকার নতুন নীতি প্রণয়নের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে। চীন সম্ভবত হবে এর মধ্যে অন্যতম। ভারতের দোরগোড়ায় দণ্ডায়মান চীন একটি প্রবল প্রভাব ও প্রতাপশালী শক্তি। চীন বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ম্যাকগ্রেগর এই মাসের শুরুতে উল্লেখ করেছিলেন, চীনা অর্থনীতি মন্থর হতে পারে। তবে চীন এখনও বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার এবং আগামী কয়েক দশক ধরে একটি কৌশলগত শক্তি হিসেবেই অবস্থান করবে। চীন সম্পর্কিত নতুন নীতি প্রণয়নের বিষয়ে চারটি প্রস্তাবনা হয়ে উঠতে পারে প্রাসঙ্গিক।

প্রথমত, ১৯৮৮ সালে সূচিত হয়ে ২০১৯ পূর্ববর্তী পর্যায়ে দুই দেশের সমঝোতায় নির্মিত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কূটনৈতিক কাঠামোটি বর্তমানে অপরিবর্তনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা ভেঙে পড়েছে। কারণটি হলো চীনের দ্বারা একটি মৌলিক বোঝাপড়ার গুরুতর উলঙ্ঘন যে, কোনো পক্ষই স্থিতাবস্থা পরিবর্তন বা ভঙ্গ করতে শক্তি প্রয়োগ করবে না বা শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেবে না। চীনের তরফে ২০১৩ সাল থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গতিবৃদ্ধি ঘটেছে গ্রে-জোন ওয়ারফেয়ার (অর্থাৎ শান্তি ও যুদ্ধকালীন— এই দ্বৈত পরিস্থিতির অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রে দুটি বিবদমান দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক লড়াই বা অশান্তি) -এর। ২০২০ সালের জুনে গালওয়ান উপত্যকায় মর্মান্তিক সম্মুখ সংগ্রামটি ছিল এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়। তখন থেকে চীনের সঙ্গে ভারত সশস্ত্র সহাবস্থানের পরিস্থিতিতে রয়েছে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বা এলএসি বরাবর তার এই গ্রে-জোন যুদ্ধ প্রশমিত করতে চীনাপক্ষ ইচ্ছুক কিনা তা স্পষ্ট নয়। যতক্ষণ না চীন তার কাজকর্মের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বিশ্বাস ও আস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি নতুন কাঠামো গঠনে এহেন পরিস্থিতি— 'নিউ নর্মাল' বা সাম্প্রতিক স্বাভাবিকতা রূপে পরিগণিত হওয়াই একটি নিয়মানুগ বিষয় স্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, গালওয়ানের পরেও ভারতের প্রতি চীনের দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত অর্থাৎ অপরিবর্তিত। ভারতকে তার সমগোত্রীয় দেশ হিসেবে মান্যতা দিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনে চীন অনিচ্ছুক। পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভারত অসমর্থ বলে মনে করে চীন। চীনের আরও ধারণা যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ও সম্পর্ক চীনের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব আধারিত বা বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অন্য দেশের প্রতি ঝুঁকে পড়া থেকে ভারতকে বিরত করতে চীন ক্রমাগত তর্জন গর্জন তথা বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করে চলেছে। তাদের অতীত অভিজ্ঞতা হতে চীন হয়তো কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ভারতকে দমিয়ে রাখতে তাদের এইসব কৌশল আদৌ ফলপ্রসূ হয়নি। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতেও এই চীনা কৌশলসমূহ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কগত নবনির্মাণে চীন প্রস্তুত কিনা তা এখনও অস্পষ্ট।

তৃতীয়ত, চীন সম্পর্কে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উপলব্ধিসমূহ চীনকে সমন্বয় সাধনকারী / অধিকতর সহনশীল হতে বা আরও জেদি হয়ে উঠতে বা শক্তি জাহিরের লক্ষ্যে চীনকে উৎসাহিত— কোনটি করে সেটাই এখন দেখার বিষয়। উন্নতির শীর্ষে চীন পৌঁছতে পেরেছে নাকি উন্নয়নমূলক রেখাচিত্রের পরিভাষায় স্থিতিশীল উন্নয়নের গতি বজায় রেখে এই গ্রাফে শুধুমাত্র প্লেটো বা মালভূমির রূপ পরিগ্রহ করেছে এই বর্তমান বিতর্ক ব্যতিরেকে মহামারীর পর চীন সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ধারণাতে পরিবর্তন এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনের প্রতি মনোভাব কঠোর হচ্ছে। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞা চীনকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। 'ডি-রিস্ক' বা চীনের থেকে ঝুঁকি মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমেরিকার সমান তালে ইউরোপীয়রা উৎসাহিত বা ব্যগ্র না হলেও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি চীনে নতুন এফডিআই (বিদেশি বিনিয়োগ)-এর পরিমাণ হ্রাস করে চলেছে।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক মহামারী চলাকালীন মানবিক বিবেচনার পরিবর্তে বাণিজ্যিক

উদ্দেশ্যে চীনের তরফে অত্যাবশকীয় পণ্য সরবরাহ আন্তর্জাতিক স্তরে চীন সম্পর্কে উদ্বেগ ও সংশয় সৃষ্টি করেছে যে বিশ্বব্যাপী সংকটে নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে চীনকে সত্যিই কতটা ভরসা করা যায়। চীনের এহেন আচার-আচরণের বিষয়ে চীনের প্রতিবেশী দেশগুলি তাই আরও সতর্ক ও সন্দিহান এবং চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে কম আশাবাদী।

চীনা অর্থনীতি বর্তমানে বেশ কিছু কাঠামোগত সমস্যার সম্মুখীন। জনসংখ্যাগত সুবিধালাভ ধীরে ধীরে শেষ হতে চলেছে। কোভিড নীতির আকস্মিক ব্যর্থতা এবং রাষ্ট্রপতি শি জিনপিঙের তরফে নিরলস, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দুর্নীতিবিরোধী প্রচারাভিযানের আহ্বান সত্ত্বেও চীনা সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতির আভাস চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর জিনপিঙের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ম্যাকগ্রেগরের বক্তব্য অনুসারে চীন মোটেই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে না এবং চীনকে একটি দশ ফুট দৈত্য রূপেও আর দেখা ঠিক হবে না। চীন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ধারণার পরিবর্তন সম্পর্কে চীনা নেতৃত্ব সচেতন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় তাদের দৃষ্টিতে নিশ্চয়তা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে তাদের দুর্বলতা সমূহ প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তার ইস্যুতে জটিলতা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সম্মুখীন তাদের হতে হয়েছে বলে তাদের নেতৃত্বের তরফে স্বীকারও করা হয়েছে.

'ফরেন পলিসি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে হ্যাল ব্র্যান্ডস ও মাইকেল বেকলির পোষিত মত অনুযায়ী, অনুকূল ও স্বল্পমেয়াদি সামরিক সম্ভাবনাগুলি যখন দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়, তখন সেই মেলবন্ধন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করে। কারণ তা চীনের মতো সংশোধনবাদী শক্তিকে করে তোলে অধিকতর হিংসাশ্রয়ী। মহামারী পরবর্তী অধ্যায়ে চীন আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে, না সহানুভূতিশীল হয়ে, সমন্বয় সাধনের অভিপ্রায়ে অন্য দেশগুলির দিকে বাড়িয়ে দেবে সহযোগিতার হাত— তার সাবধানী বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সর্বোপরি, আগামী নভেম্বরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অনিশ্চিত ফলাফলের মাধ্যমে ২০২৪ সালে চীনের আচরণ তার প্রকৃত রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। আমেরিকার একটি অংশের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মতপার্থক্যজনিত কারণে আমেরিকা-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একাধিক চ্যুতি রেখা বিদ্যমান, যেগুলির সমাধান ও নিরসন ছাড়াই বর্তমান আমেরিকা-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটি একটি অস্থায়ী ভারসাম্যের মধ্যে অবস্থান করছে। আমেরিকার প্রতি চীন যে কৌশলগত (স্ট্র্যাটেজিক) চ্যালেঞ্জসমূহ ছুঁড়ে দিয়েছে, সেই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটটিকে বর্তমান রাষ্ট্রপতি বাইডেন বা পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প উভয়েই তুলে ধরে সেই বিষয়ক রূপরেখার অবতারণা করলেও নীতিগত বিবরণের বিষয়ে দ্বি-দলীয় ঐক্যমত্য দূর অস্ত। রাষ্ট্রপতি হওয়ার দৌড়ে কে জিতবে এবং নভেম্বর পরবর্তী পর্যায়ে চীনের সম্পর্কে আমেরিকান নীতি কী হবে সেই বিষয়গুলিতে স্বচ্ছতার অভাব থাকার দরুন বাড়ছে উদ্বেগ।

নভেম্বরের পর বাইডেন বা ট্রাম্প—যিনিই রাষ্ট্রপতি হোন, তার পরিচালনায় ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সদর্থক ও ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকবে বলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। প্রশ্ন হলো, চীন কি এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে নতুন, পরিবর্তিত ভারতের অস্তিত্বকে স্বীকার করবে এবং অতীত অপেক্ষা ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে?

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে (ভারতে) সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন সীমান্তে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। পরবর্তী কয়েকটি মাস বিপদজনিত ঝুঁকি প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা হয়ে উঠবে একটি অগ্রাধিকার। কিন্তু নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উপায়সমূহ অন্বেষণ উভয় দেশের পক্ষে বিচক্ষণতার কাজ হবে। দু'টি প্রধান অর্থনীতি এবং পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রতিবেশীর সম্পর্ক অনির্দিষ্টকাল ধরে এমতাবস্থায় পর্যবসিত হতে পারে না। এই সম্পর্ক এইভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না।

লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (এলএসি) বা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর জবরদস্তি এলাকা দখলের লক্ষ্যে চীনের আক্রমণাত্মক চেহারার মোকাবিলা এবং চীনা আচরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারত সরকার দেশের সীমানা রক্ষায় তার নীতি ও সংকল্পের পরিচয় প্রদর্শন করেছে। ভবিষ্যতের এই সন্ধিক্ষণে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের যথোপযুক্ত সম্ভাবনার সন্ধানের সঙ্গে পাহারাদারি বিন্দুমাত্র শিথিল না করে সীমান্ত নিরাপত্তা অটুট রাখার ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 'Talk-and-deter' (অর্থাৎ 'আলোচনা ও প্রতিরোধ')— সম্ভবত আগামীদিনের এগিয়ে চলার অন্যতম পথ।

(লেখক ভারতের পূর্বতন পররাষ্ট্র সচিব)

শোক সংবাদ

দক্ষিণ কলকাতা নেতাজীনগর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ডাঃ ডালু হালদার (মিহিরকান্তি) গত ৭ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও পুত্রদের রেখে গেছেন। সত্তরের দশকে তিনি স্বয়ংসেবক হন। শ্রীরামমন্দির মুক্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ কলকাতার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। বহু মানুষের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। এছাড়া নানারকম সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক, বর্তমানে মধ্যবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সৎসঙ্গ প্রমুখ অশোক সাহার মাতৃদেবী কল্যাণী সাহা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার নরসিংহপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

টিভি নাইন নেটওয়ার্কের বার্ষিক কনক্লেভ আজ ভারত যা ভাবে...

নতুন দিল্লিতে গত ২৫ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দেশের অন্যতম জনপ্রিয় বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম টিভি নাইন নেটওয়ার্কের বার্ষিক কনক্লেভ, যার শিরোনাম ছিল 'হোয়াট ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুডে', তার শিখর সম্মেলনের দ্বিতীয় সংস্করণ। শাসক থেকে বিরোধী, 'হোয়াট ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুডে'-তে এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সকলেই। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য।

এই কনক্লেভের নামকরণের ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতির পাঁচ স্তম্ভ হলো— সম্মান, সংলাপ, সমৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এই পাঁচ স্তম্ভের মাধ্যমে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক কূটনীতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং দেশের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি বদলে দিচ্ছেন। ২০২৪-য় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই, বিশ্বে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধিতে, দেশের প্রাণবন্দ সংস্কৃতি, রন্ধনপ্রণালী, দর্শন ইত্যাদিকে এক 'সফট পাওয়ার' হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতকে বিশ্বের এক প্রধান শক্তি হিসেবে দেখেন মোদী। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়েছেন। কীভাবে তিনি আজকের এই বিশ্বনেতা হয়ে উঠলেন? এর পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বৈশ্বিক অর্থনীতির বৃদ্ধিকে উৎসাহ দান, মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং দুর্নীতি বিরোধী ও সামাজিক ঐক্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিই তাঁকে এই জায়গায় এনে দিয়েছে। তাঁর শাসনকালে, তিনি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকগুলিতে অংশ নিয়েছেন। অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নে ভারতের নরম শক্তিগুলিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র নন-অ্যালাইনমেন্ট মুভমেন্টের এক সদস্য। প্রধানমন্ত্রী মোদী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই অবস্থান পালটে, বিশ্বের প্রধান ও মধ্যম শক্তির দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদার করেছেন। আর এর ফলে বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে আজকের ভারত।

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ভারতের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আরব উপসাগরীয় অঞ্চল এখন ভারতের 'বর্ধিত প্রতিবেশী' নীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদী আবু ধাবিতে ইউপিআই এবং রুপে কার্ড পরিষেবা চালু করেছেন। নেপাল, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, মরিশাস ও শ্রীলঙ্কার পরে বিশ্বের সপ্তম দেশ হিসেবে ভারতের ইউপিআই পেমেন্ট পরিষেবা গ্রহণ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় কূটনীতির জেরেই পশ্চিমি বিশ্ব এখন ভারতকে বিশ্বের একটি প্রধান শক্ত হিসেবে বিবেচনা করছে। আর প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজে পরিণত হয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক মধ্যস্থতাকারীতে, এক বিশ্বনেতায়। গোটা বিশ্বে আজ মোদীর বার্তা খুব স্পষ্ট, ভারত শান্তি চায়। ভারত কোনও দেশকে হুমকি দেয় না।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষায় গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে ভারত। চীনের মোকাবিলায় অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস বা আসিয়ান গোষ্ঠীর দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করেছে। ক্রমে ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্রগুলির জন্য প্রাথমিক নিরাপত্তা প্রদানকারী দেশ হয়ে উঠছে। জাপানের সঙ্গে ভারতের শক্তিশালী বন্ধন এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য তৈরি করছে। নইলে পুরোটাই চলে যেত চীনের গ্রাসে। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের অধীনে এই গোষ্ঠীতে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি এবং সৌদি আরব, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে একটি নতুন অর্থনৈতিক রেল ও শিপিং করিডর প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি, একটি প্রভাবশালী বিশ্বনেতায় পরিণত করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। এই কূটনৈতিক সাফল্য তাঁকে বিশ্বে 'গ্লোবাল সাউথে'র প্রধান কণ্ঠস্বর হিসেবেও তুলে ধরেছে।

বিগত দশ বছরে ভারতে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ শুধু দেশের আর্থিক বৃদ্ধিকেই তরান্বিত করেনি, ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যেরও তা মাপকাঠি বলে মোদীর বক্তব্যে তা উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে কোভিড কালের সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের মানবিক ভূমিকাও যে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শুধু সচলই রাখেনি, বিশ্বে ভারতের কূটনৈতিক দৌত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে মোদীর বক্তব্য : 'দুনিয়া অবাক ভারতকে দেখে। গোটা বিশ্ব ভারতের সঙ্গে চলায় নিজের সুবিধা দেখছে। সবাই ভাবছে, ভারত এটাও করে ফেলল? এটাই বিশ্বের নিউ নর্মাল। ১০ বছরের এফডিআই দেখুন। গত সরকারের আমলে ১০ বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের এফডিআই এসেছিল। আমাদের সরকারের ১০ বছরে ৬৪০ বিলিয়ন ডলারের এফডিআই এসেছে। ১০ বছরে ডিজিটাল ক্রান্তি এসেছে। ভ্যাকসিনে বিপ্লব এসেছে। করোনাকালে করদাতার পরিমাণ দেখে বোঝা গিয়েছে, ভারতের জনগণের সরকারের উপরে ভরসা বাড়ছে... এই পরিবর্তনের কারণ হলো আমাদের কর্ম সংস্কৃতিতে পরিবর্তন। অফিস, ফাইল, কর্মী একই রয়েছে। সরকারি দপ্তর আজ দেশবাসীর সমস্যা নয়, সমাধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। □

নোয়াখালি থেকে সন্দেশখালি আর কতদিন চলবে?

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশুদের কলকাকলি অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন একটু বেশিই ছিল। কাকভোর থেকেই গৃহস্থবাড়ির লোকজনদের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। ঘরে ঘরে আলপনা, শিল-নোড়ায় চালবাটা, মশলা বাটার শব্দ, বাতাসে ভেসে আসছিল নতুন গুড়ের পায়েসের গন্ধ— সব মিলিয়ে এক উৎসবের পরিবেশ।

বাড়ির বউ-ঝিরা শেষ রাত্রেই উঠে পড়েছে। কাজ কী কম! স্নান সেরে নতুন কাপড় পরে কেউ নারকোল কোড়াতে বসে গেছে, কেউ-বা বটি পেতে কুটনো কুটতে বসে গেছে। খিচুড়ি করতে হবে, তার সঙ্গে পাঁচরকমের ভাজা, লালশাক, ফুলকপির তরকারি, লুচি, চাটনি, পায়েস। ঠাকুমা, পিসিমারাও কেউ বসে নেই। দাওয়ায় পা-ছড়িয়ে বসে তারা প্রদীপের সলতে পাকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের হাঁকডাকও শোনা যায়— 'ও বড়ো বউ, পোলাপানগো মুড়ি দিওনা, সাবু ভিজানো আছে, দুধ কলা দিয়া মাইখ্যা দাও, ওরাও তো অঞ্জলি দিব।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের আসন সাজানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রতিমার সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া, পিটুলি গোলা দিয়ে আলপনা দেওয়া— দেবীর পদচিহ্ন, ধানছড়া, আরও কত নকশা। কমবয়সি মেয়েরা আলপনা দিতে খুব উৎসাহী, কে কত দৃষ্টিনন্দন আলপনা দিতে পারে, তারই যেন প্রতিযোগিতা চলছিল।

কর্মব্যস্ততার মধ্যেই কে যেন চেঁচিয়ে বলে— 'ওরে কাঁসর ঘণ্টা তুইল্যা রাখ, আইজ বাজাইতে নাই, তাইনে আওয়াজ পছন্দ করে না।' কচিকাঁচারা বাগানের ঘাস ছিঁড়ে এনেছিল, সেই ঘাস থেকে দূর্বা বেছে বেছে পিতলের থালায় সাজানো, লাল চন্দন, সাদা চন্দন ঘষা— সে এক কর্মযজ্ঞ। সবার মুখে হাসি, মনে খুশির জোয়ার। হবেই তো, বছরে এই একটা দিনই তো বাড়িতে পূজা হয়, আত্মীয়-বন্ধুরা আসে, সবাই মিলে আনন্দ করা। রোজ তো আর হয় না, এই দিনটা তার স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। হ্যাঁ, দিনটা ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন--- ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬। এই পূর্ণিমায় মা আসেন নতুন রূপে, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না গায়ে মেখে গৃহস্থের সংসার ধনসম্পদে ভরিয়ে দিতে। কোনও কোনও বাড়িতে প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পূজাও হয়। পূজা অন্তে পুরোহিতমশাই ব্রতকথা শোনান, সবাই মন দিয়ে শোনে— 'রাম ও রহিমে জেনো কভু নাহি ভেদ। ত্রিভুবনে এই দুই জানিবে অভেদ।।'

হঠাৎ পুরোহিতের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে এক তীব্র কোলাহল শোনা গিয়েছিল। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাইরে ছুটে গিয়েছিল। চিৎকার ক্রমশ নিকটবর্তী হয়। এক পৈশাচিক উল্লাসধ্বনি শোনা যায়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই একদল সশস্ত্র মানুষ ঢুকে পড়েছিল। হ্যাঁ, ওরা মানুষই ছিল চেহারায়। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা নিরস্ত্র নিরপরাধ নারী-পুরুষের ওপর। শিশুরাও রেহাই পায়নি। আক্রমণকারীদের হাতে ছিল রামদা, ছুরি, ধারালো বল্লম— চলেছিল নির্বিচারে হত্যালীলা। সে রাতে কেউ ছাড় পায়নি। কারও কাকুতি মিনতি শোনেনি ওরা। দেবীমূর্তিকেও ছাড় দেয়নি। অপবিত্র করেছে প্রতিমা। পদাঘাত করে ঘট উলটে দিয়েছে। ঠাকুরঘরে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে অন্য ঘরগুলিতে ঢুকে তল্লাশি চালিয়েছে— কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই তো? মালাউনগুলোকে খতম করতেই হবে। সময় বেশি লাগেনি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বিনা প্রতিরোধে এক নৃশংস হত্যালীলা শেষ করে পরবর্তী শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। পড়ে থাকে কতগুলি প্রাণহীন দেহ আর এক দমবন্ধকরা নিস্তব্ধতা, যেখানে মাত্র কিছুক্ষণ আগেও ছিল আনন্দিত প্রাণের উচ্ছলতা। পূর্ণিমার চাঁদ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। পিটুলি গোলার আলপনা রক্তের স্রোতে ধুয়ে গিয়েছিল। হামলা চলেছিল পুরো নোয়াখালি জুড়ে। জেহাদিরা চলে যাবার পরে নেমে এসেছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে কুকুরের কান্না ভেসে আসে, হয়তো তার প্রভুকে সে আর কোনওদিন ফিরে পাবে না।

নোয়াখালি গণহত্যার আগেও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়েছিল। সমগ্র বঙ্গেই বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছিল। ওই সময় অবিভক্ত বঙ্গের শাসক ছিল মুসলিম লিগের সাইদ সুরাবর্দি। ১৯৪৬ সালের ২৭ জুলাই বোম্বেতে মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন প্রস্তাব গৃহীত হয় জিন্নার নেতৃত্বে। এই প্রত্যক্ষ কর্মসাধনের দিন হিসেবে ১৬ আগস্ট দিনটি ঠিক করা হয় এবং বধ্যভূমি হিসেবে স্থান নির্বাচিত হয় আমাদের এই কলকাতা। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে হাজার হাজার মা-বোনদের উপর বলাৎকার, অসংখ্য নারীহরণ, হাজার হাজার হিন্দু পরিবার শ্মশানে

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য সন্দেশখালি আছে যেগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য।

পরিণত হয়েছিল। হত্যালীলা শুরু হয়েছিল ওইদিন অতর্কিতে। হিন্দু সমাজ ছিল টার্গেট, যারা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনা আর আছে কিনা, আমার জানা নেই। তিনদিন একতরফা মার খাওয়ার পর হিন্দুরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। নির্ভীক, বীর গোপাল মুখার্জীর সাহসের উপর নির্ভর করে। তাঁকে গোপাল পাঁঠা বলে লোকে চিনত। কারণ তাঁর মাংসের দোকান ছিল। নিরীহ নিরস্ত্র হিন্দুদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। যখন তারা প্রতিরোধ করেছিল অহিংসার পূজারি গান্ধীজী গোপাল মুখার্জীকে বলেছিলেন অস্ত্র ত্যাগ করে অহিংসার পথ অবলম্বন করতে। তার উত্তরে গোপাল বলেছিলেন যে তিন দিন ধরে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলল সুরাবর্দির নির্দেশে, গান্ধীজী এই কথাটি মুসলমান নেতাদের বললেন না কেন? তিনি যদি তাদের এই একই কথা বলতেন, তাহলে কয়েক লক্ষ হিন্দুর জীবন, নারীর সম্ভ্রম, ঘরসংসার, দোকানপাট ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যেত।

আজ গোপাল মুখার্জী নেই। শ্যামাপ্রসাদ নেই, যিনি হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতালোভী নেতাদের অবিমৃশ্যকারিতার দরুন সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাস পালটে গেছে। লাগোয়া বাংলাদেশ থেকে কাতারে কাতারে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর দল পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে সেই সিপিএম জমানা থেকে। সেই ধারা বর্তমান শাসক অব্যাহত শুধু রাখেনি, বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এদের নকল আধার কার্ড, ভোটার আই ডি জোগান দেওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। যে সীমান্তের এক বিরাট অংশ অসুরক্ষিত। চেক পোস্ট বসাবার জন্য কেন্দ্র সরকার বহুবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জমি দিতে বলা সত্ত্বেও জমি তারা পাচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসহযোগিতার কারণে। ওই বিশাল সীমান্ত কাঁটাতারবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে, অনুপ্রবেশ অবাধে চলছে। তারা শাসক দলের ভোটব্যাংক, তাই তারা এই রাজ্যে জামাই আদর পায়। দলে দলে রোহিঙ্গা মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে বসিরহাটে। তাদের জন্য বাসস্থান, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়। যার প্রধান উদ্যোগে এই কর্মকাণ্ড হয়ে চলেছে কয়েক বছর যাবৎ, তার নাম হলো শেখ শাজাহান।

ওই শাজাহানের অবৈধ আর্থিক কাজকারবারের সন্ধান পেয়ে অফিসাররা তল্লাশি চালাতে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। খবর পেয়েই সে গা ঢাকা দেয় এবং কোনো গোপন স্থান থেকে ফোন করে কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে আনিয়ে ইডি অফিসারদের উপর হামলা চালায়। প্রথম সারিতে ছিল সশস্ত্র মহিলারা। যারা অফিসারদের মাথা ফাটিয়ে দেয়, তাঁদের গাড়ি পুড়িয়ে দেয়, তাদের নিরাপত্তারক্ষীদের ধাক্কা মারে, নানাভাবে তাদের বিরক্ত করার চেষ্টা করে যাতে তারা বাধ্য হয়ে গুলি চালায়। শাজাহান পরিকল্পনা মাফিক এই ঘটনা ঘটায় কিন্তু রক্ষীরা মার খেয়েও গুলি চালায়নি। অফিসাররা কেউ নৌকায়, কেউ অটোতে করে পালিয়ে যায়। অকুস্থলের নাম সন্দেশখালি, বসিরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।

এরপর 'রিপাবলিক বাংলা'র সাংবাদিকরা সেখানে যান খবর সংগ্রহের জন্য। শাসক দলের উচ্ছিষ্টভোগী মিডিয়া এই খবর চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা ঘটা করে সম্প্রচার করেছে, কিন্তু সন্দেশখালির ঘটনায় নীরবতা পালন করেছে। পরবর্তীতে তারা যখন দেখল এই ঘটনা নিয়ে সারা দেশ উত্তাল, তখন তারা নড়ে চড়ে বসেছে।

এরপর যে সব সংবাদ আমরা পেতে শুরু করি মূলত 'রিপাবলিক বাংলা' মারফত, তা রোমহর্ষক, এক কথায় ঘৃণ্য, অবিশ্বাস্য। সন্দেশখালির মহিলারা একজোট হয়ে ঝাঁটা, লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবিতে। আমরা ক্রমশ জানতে পারি যে গ্রামের মহিলাদের তৃণমূলের নেতারা রাত বারোটা, একটা নাগাদ ঘরে এসে তুলে নিয়ে যেত তাদের পার্টি অফিসে। গ্রামের ঘর ঘর থেকে এরা মেয়ে-বউদের নিয়ে যেত, কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওরা বলত 'মিটিং' আছে। যেতে হবে অথবা বলতো— পিঠে বানাতে হবে। কখনো বলতো 'লুচি মাংস করতে হবে', লোকজন আসবে। এরপর পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে ওই অসহায় মেয়ে-বউদের গণধর্ষণ করা হতো। পরিবারের কমবয়সি, স্বামীরা বাধা দিতে এলে তাদেরকে বেধড়ক পেটানো হতো। কোনও কোনও মেয়েকে পরদিন ছেড়ে দিত, কাউকে আবার বেশ কয়েকদিন পরে ছাড়ত। তাদের শাসানি দিত এই বলে যে এসব কথা যদি কাউকে তারা বলে তাহলে তার সমগ্র পরিবারের লাশ ফেলে দেবে।

এই দুষ্টচক্রের মাথা হলো শেখ শাজাহান যে আগে সিপিএম করত, রাজনৈতিক পালাবদলের পরে সে তৃণমূল হয়ে যায়। এর সাঙ্গোপাঙ্গরা খুবই ক্ষমতাশালী। তাদের দিয়ে শাজাহান গরিব গ্রামবাসীদের জমি বলপূর্বক দখল করে, একরের পর একর চাষের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে জমিগুলি চাষের অযোগ্য করে তোলে। সেখানে মাছের ভেড়ি তৈরি হয়, চিংড়ির চাষ হয়। ওই চিংড়ি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রির জন্য যায়, মোটা টাকা আমদানি হয়, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত নেতাদের টালির বাড়ি প্রাসাদে পরিণত হয়। এর সব কিছুই হয় শাজাহানের নেতৃত্বে, সে টিএমসি নেতা এবং প্রতিষ্ঠিত জমি মাফিয়া।

নির্যাতিতা মহিলারা থানায় নালিশ জানাতে গেলে পুলিশ তাদের লিখিত বয়ান নেয় না, এফআইআর নেয় না। পুলিশ বলে 'যাও, গিয়ে শেখ সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাও'। শেখ সাহেব হলো শেখ শাজাহান, সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা। তৃণমূল দলের মন্ত্রীসান্ত্রীরা বলছে এ সবই বিজেপির চক্রান্ত, ওইসব মহিলারা টাকা খেয়ে মিথ্যা কথা বলছে। তৃণমূলের এক বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেছেন যে এই সব গ্রামবাসীরা এসসি/এসটি মোটেই নয়, কারণ এদের গায়ের এবং কুচকুচে কালো নয়, তাই মুখ ঢেকে ক্যামেরার সামনে আসছে।

মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যন্ত সন্দেশখালি যেতে পারলেন না, অথচ তিনি দলবল নিয়ে হাথরাস ছুটে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁর নিজের রাজ্যে এই রকম নৃশংস কাজকর্ম অবাধে চলেছে আর তিনি সন্দেশখালি যাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাঁচশো টাকা থেকে বাড়িয়ে হাজার টাকা করে দিলেন। অত্যাচারিতা, নির্যাতিতা মহিলারা বলছেন, 'এটা কি আমাদের ইজ্জতের দাম, নাকি তৃণমূলের নেতাদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য পুরস্কার?' সঙ্গত প্রশ্ন।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন এ সবই নাকি বিজেপি ও

আরএসএস-এর ষড়যন্ত্র। তিনি বললেন যে ওখানে আরএসএসের বাসা আছে। সবটাই সাজানো। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী, আপনার পুলিশ শাহজাহানের দুই শাগরেদ শিবু হাজরা আর উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করলো কেন? তাও গণধর্ষণের কেসে অভিযুক্ত হিসেবে। বসিরহাটের এমপি নুসরৎ জাহান আজ পর্যন্ত সন্দেশখালি যাননি। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সন্দেশখালি গেছেন। নির্যাতিতা মহিলারা তাঁর কাছে কাতর আবেদন জানায় তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য। রাজ্যপাল ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শুনেছেন। দিবাকর সিংহ নামে এক গ্রামবাসী জানান যে তাঁর জমি শাজাহানের নেতৃত্বে জবরদখল করা হয়, সেই কেড়ে নেওয়া জমিতেই তৈরি হয়েছে প্রাসাদোপম তৃণমূল পার্টি অফিস যেখানে মেয়েদের নিয়ে এসে বলাৎকার করা হয়।

আরেকটি চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া গেল ওই মহিলাদের বয়ান থেকে। শাজাহানের লোকেরা বেছে বেছে হিন্দু মহিলাদেরই তুলে নিয়ে যেত, তাদের শাঁখা-পলা ভেঙে ফেলত। কখনও ভুলেও সংখ্যালঘু পরিবারের উপর কোনও হামলা এরা করত না। অত্যাচারিতা মহিলারা ১০০ শতাংশই হিন্দু, এই তথ্য সন্দেশখালির মহিলারা নিজেরাই জানাচ্ছেন। এতদিন ভয়ে এঁরা মুখ খুলতে পারেননি, কিন্তু আজ তাঁদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে এখন প্রতিরোধ ছাড়া বাঁচবার কোনও পথ নেই।

মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা হয়ে মহিলাদের প্রতি এতটা নির্দয় কী করে হলেন? তিনি পুলিশমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে পুলিশকে দলদাস বানিয়ে ছেড়েছেন, তাই আজও নাটের গুরু শাজাহান ধরা পড়েনি। পুলিশমন্ত্রী তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছেন, সেই গোপন ডেরা থেকেই সে উকিলের মাধ্যমে কোর্টকেস লড়ছে, ভিডিয়ো কল করলে তার শাগরেদদের উদ্দেশ্যে মিডিয়ার মারফত সারাদেশ দেখতে পাচ্ছে অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। একমাস হয়ে গেছে সে লুকিয়ে আছে কোন গর্তে, পুলিশ জানে না। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? মুখ্যমন্ত্রী দুম করে ১৪৪ ধারা সন্দেশখালিতে জারি করে দিলেন। হাইকোর্ট সেটা বাতিল করে দিল। আবার ১৪৪ ধারা জারি করা হলো। মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টের অর্ডারও মানেন না। একেই বলে স্বৈরতন্ত্র!

পশ্চিমবঙ্গের সৌভাগ্য যে একজন এমন রাজ্যপাল আছেন, যাঁর মধ্যে মানবিকতা আছে, আর আছে কর্তব্যবোধ, সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধতা। রাজ্যপাল মহোদয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু নির্দেশ পাঠিয়েছেন, সেগুলির উত্তর আসার অপেক্ষায় তিনি আছেন। রাজ্যপাল একটি সিট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন।

রাজ্যপাল রাজভবনের গেট খুলে দিয়েছেন নির্যাতিতা নারীদের সুরক্ষার জন্য। অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনা তিনি নিজে সরেজমিন তদন্ত করে জেনেছেন সন্দেশখালি গিয়ে। মহিলারা এখনও আতঙ্কগ্রস্ত, শাজাহানের গ্যাং মেম্বাররা তাদের প্রতিবাদকারী স্বামীদের উপরেও অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। সন্দেশখালির হিন্দু পরিবারগুলির পুরুষ সদস্যরা আজও ঘরছাড়া। মহিলারা সারারাত দলবদ্ধ হয়ে জেগে বসে থাকে, তৃণমূলের বাইকবাহিনী সারাক্ষণ টহল দিয়ে বেড়ায়।

রিপাবলিকের রিপোর্টারদেরও মারধোর করা হয়েছে, ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রামের মহিলাদের শাসানি দেওয়া হচ্ছে এই বলে যে মিডিয়া চলে যাক, তারপর মজা দেখানো হবে। গ্রামের মহিলারা রাতে বিপদের গন্ধ পেলেই শাঁখ বাজাচ্ছে, কাঁসর বাজাচ্ছে সবাইকে সতর্ক করার জন্য।

আশ্চর্যের বিষয় হলো সন্দেশখালির জঘন্য নৃশংস ঘটনার নিন্দা সারা দেশে শুধু নয়, বিদেশের ভারতীয় সমাজেও ঝড় তুলেছে অথচ এই রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। এরা প্যালেস্তাইনের জন্য, হামাসের বাহিনীর জন্য, বাবরি ধাঁচার জন্য, গুজরাটের দাঙ্গার জন্য কেঁদে কঁকিয়ে একশা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায়, কাশ্মীর থেকে হিন্দু বিতাড়নের জন্য, লাউডস্পিকারে যখন ঘোষণা করা হয় যে 'হিন্দুরা তোমরা পুরুষরা তিনদিনের মধ্যে বেরিয়ে যাও, পরিবারের মেয়েদের রেখে যাবে, এর অন্যথা হলে তোমাদের লাশ ফেলে দেওয়া হবে', তখন এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মৌনীবাবা সেজে থাকেন। এদের বুদ্ধিজীবী না বলে ভাতাজীবী বলা ভালো, মুখ্যমন্ত্রী এদের বিভিন্ন সরকারি কমিটি, কমিশন, বিভিন্ন অ্যাকাডেমি, সদন, মঞ্চ ইত্যাদির মাথায় বসিয়ে দিয়েছেন। এরা বসে বসে মোটা টাকা কামাচ্ছেন। এর ওপর 'ভূষণ, 'বিভূষণ' ইত্যাদি তো আছেই। সুতরাং ধামা ধরে থাকাই তাঁদের একমাত্র কাজ। এদের প্রগতিশীলতার মুখোশটা আজ খসে পড়েছে।'

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার কথা বলেছেন। 'ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউলড কাস্টস্' সংস্থার চেয়ারম্যান অরুণ হালদারও সন্দেশখালি ঘুরে দেখে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলেছেন। সন্দেশখালি গ্রামের ৮০ শতাংশ মানুষ তপশিলী।

মাফিয়া ডন শাজাহানকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন জানালেন, ইডি নাকি নির্দোষ শাজাহানকে টার্গেট করেছিল। এর অর্থ ইডি দোষী, শাজাহান ভালো মানুষ!

রিপাবলিক বাংলার রিপোর্টার সন্তু পানকে বিনা নোটিশে, মিথ্যা কেস সাজিয়ে বিনা প্রমাণে গ্রেপ্তার করা হলো। সন্দেশখালির অত্যাচারিতা মা-বোনদের হয়ে কথা বলার জন্য তাঁকে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশাল পুলিশ বাহিনী খুব বীরত্ব দেখাল। অবশ্য কী করবে তারা, উপরওয়ালার নির্দেশ না মানলে চাকরি হারাতে হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখটা গণতন্ত্রের জন্য একটি কালো দিন, একটি কলঙ্কের দিন হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের উপর এই আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর কি সম্মান বাড়াবে? প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল, শাজাহানকে আজও পুলিশ ধরতে পারল না অথচ সাংবাদিককে টেনে হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হলো।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বহু সন্দেশখালি আছে যেগুলি ক্রমশ প্রকাশ্য। জানা গিয়েছে যে উত্তম সর্দারের আসল নাম নূর আলম, সে নাকি মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গাই, কাজেই তাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ মুক্তাঞ্চল, দারুল হারব দারুল ইসলাম হতে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল নোয়াখালি, যেমন হয়েছে কাশ্মীর। রাজনৈতিক মদতে দুধেল গাইয়েরা ক্রমশ সংখ্যায় বাড়বে শাজাহানদের ক্ষমতা আরও বাড়বে, সরকারি বদান্যতায়। হিন্দুরা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, প্রগতিশীল ভাতাজীবী হিন্দুরাও রেহাই পাবে না। ◻

সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্যের মহিলাদের চোখ খুলেছে

আনন্দ মোহন দাস

সন্দেশখালির ভয়ংকর ঘটনা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। আইনশৃঙ্খলার অবনতি, দুর্নীতি, সিন্ডিকেটরাজ, ধর্ষণ, খুন, রাহাজানির কথা পশ্চিমবঙ্গে নতুন কিছু নয়। আমরা রাজ্যে কামদুনি, সুটিয়া গণধর্ষণের কথা শুনেছি কিন্তু সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার, যৌন শোষণ ও দুষ্কর্মের ভয়ংকর ঘটনা নিরন্তর ঘটেছে তা সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সন্দেশখালির ঘটনা দেশের কাছে লজ্জাস্বরূপ। সংবাদে প্রকাশ, গত ৯ ফেব্রুয়ারি এক নিষ্পাপ শিশুকেও মায়ের কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এদের কাছ থেকে শিশুরাও রেহাই পায়নি এবং রাতের অন্ধকারে পুলিশের পোশাকে এলাকায় তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে প্রশ্ন উঠেছে। তাই এলাকার মহিলাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় দলবদ্ধ ভাবে লাঠি হাতে সমাজবিরোধী তৃণমূল নেতা মাফিয়া ডন শাজাহান ও তার সাগরেদ উত্তম সর্দার, শিবু হাজরার সন্ত্রাস উপেক্ষা করে একজোট হয়ে প্রকাশ্যে প্রতিবাদে নেমেছে। এই শাজাহানকেই রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ইডি-কে আক্রান্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়। এই সব বিষয়ে সারা দেশের মধ্যে সংবাদ শিরোনামে থেকে এই রাজ্য তার কৌলীন্য হারিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায় দুর্বৃত্তায়নে পরিণত হয়েছে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্প কারখানার পরিবর্তে বোমার কারখানা তৈরি হয়েছে যা সংবাদপত্রের শিরোনামে বার বার উঠে এসেছে। সারা রাজ্যে শাসক দলের মদতে বিভিন্ন স্থানে সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য গড়ে উঠেছে। ভোটের লড়াইয়ে দুধেল গাইয়েরা নির্ণায়ক ভূমিকায় রয়েছে এবং তার ফলে শাসকদলের মদতে এলাকায় তাদের দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন জায়গায় দখলদারি ও ক্ষমতার আস্ফালন অধিক মাত্রায় বেড়েছে। পুলিশ প্রশাসনও উপরতলার নির্দেশে নিরপেক্ষতা হারিয়েছে। তার ফলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীদের কণ্ঠরোধ করাটাই

তাদের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিরোধী দলের রাজনৈতিক আন্দোলনের টুঁটি টিপে গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চলেছে। এই রাজ্যে আইনের শাসনের পরিবর্তে শাসকের আইন চলেছে। এখানে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে এবং দৃঢ়চেতা বিচারপতিদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। এই রাজ্যে মনমাফিক রায় না হলে বিচারকের চেম্বারের সামনে অবস্থান করে আদালতের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো হয়। এরাই আবার বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ বলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে সংবিধানের কাঠামো ধ্বংস হচ্ছে বলে চিৎকার করে থাকে। এই রাজ্যে রাতের অন্ধকারে হাইকোর্টের বিচারপতির বাড়িতে হুমকিমূলক পোস্টার সাঁটানো হয়। আদালতের বিচারকদের এই দুরবস্থা, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তারে উৎসাহ দেখায় না, অথচ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা- নেত্রীদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশের অতি সক্রিয়তা চোখে পড়ে। এই রাজ্যে সিন্ডিকেট, মাফিয়া ও গুন্ডারাজ, বালি, পাথর, কয়লা, চাকরি, রেশন চুরি, একশো দিনের কাজ, আবাস যোজা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আপাদমস্তক দুর্নীতি যেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। যার ফলে রাজ্য সরকার আদালতে বারবার ধাক্কা খেয়েছে। সূত্র মারফত জানা যায় এ রাজ্যের অডিট রিপোর্টে নাকি ক্যাগ (সিএজি) কোটি কোটি টাকার গরমিলের কথা উল্লেখ করেছে যা নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকার একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীও জেলে রয়েছেন। এ রাজ্যে শাসকদলের মদতে অপরাধীরা আইনশৃঙ্খলা নিজেদের হাতে নিয়ে সর্বত্র দাপিয়ে বেড়ায়। দেখা গেছে এ

রাজ্যের পুলিশ শাসকদলের নেতা ও গুন্ডাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়ে। প্রকাশ্যে অত্যাচার ও অন্যায় পুলিশের গোচরে থাকলেও প্রকৃত শাস্তির অভাবে অপরাধীদের দাপট বেড়ে চলেছে। কারণ এরাই শাসকদলের নির্বাচনী বৈতরণী পার করে এবং অর্থের মধুভাণ্ড হাতে নিয়ে নেতাদের টাকার জোগান দেয়।

সে জন্যই শেখ শাজাহানদের এতো দৌরাত্ম্য। তাই পশ্চিমবঙ্গ হলো সারা ভারতে একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রত্যেকটি নির্বাচনে হিংসার বলি হয়ে শতাধিক লোকের মৃত্যু ঘটে এবং বহু লোক জখম হয়। এই রাজ্যে ভয়মুক্ত, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচন এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে, যেখানে সারা দেশে নির্বাচনী সংঘর্ষ অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। বিগত বারো বছরে পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে এবং দুর্নীতিতে শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

সন্দেশখালির ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে বিহারের লালুপ্রসাদের জঙ্গলরাজের কথা মনে পড়ে। বুনিয়াদি উন্নয়নের পরিবর্তে শাসকগোষ্ঠী ৫০০, ১০০০ টাকার ভাতা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম রেখেছে। এ সরকার দানখয়রাতির জন্য, পরিত্রাণের জন্য। যার ফলে বাঙ্গালির মেরুদণ্ড আজ দুর্বল। সেজন্য এ রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতিতে মউ স্বাক্ষর হলেও শিল্পপতিরা রাজ্যে বিনিয়োগ করতে চান না। বলাবাহুল্য, সমাজবিরোধীরা টাকা ও ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গেলে তারাই এলাকায় সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ হলো রেশন দুর্নীতির মাথা হিসেবে অভিযুক্ত জেলবন্দি সদ্য প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সাগরেদ তৃণমূল নেতা শেখ শাজাহান। তার বিশাল সাম্রাজ্য হলো সন্দেশখালি যা বাংলাদেশ সীমান্তের খুব একটা দূরে নয়। যার ফলে এখানে মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গাইদের রমরমা। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের শাজাহান ও সন্দেশখালি অনেক রয়েছে যা এখনও সংবাদমাধ্যম, মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসেনি। এখানে নারীজাতির উপর এই জঘন্য অপরাধই এই সরকারের পতনের সূচনা করবে।

যেমন মহাভারতে দুর্যোধনের দ্বারা দ্রৌপদীর উপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার পরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে কৌরবকুল ধ্বংস হয়েছিল এবং রামায়ণে সীতার লাঞ্ছনার পরই রাবণরূপী অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটেছিল। তাই সন্দেশখালির ঘটনা থেকেই বর্তমান অপদার্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের পতনের শুরু বলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা মনে করেছেন। যদিও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তথা ভাতাজীবীরা সন্দেশখালির মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। সন্দেশখালিতে পরিকল্পিতভাবে মায়েদের উপর ঘৃণ্য অপরাধ ও জনজাতিদের জমি জায়গা দখল করে ভেড়ি তৈরি করা শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির সমস্যা নয়। এর পিছনে দুধেল গাইদের অন্য খেলাও রয়েছে। এ রাজ্যে সন্দেশখালির ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর এই এলাকায় নিত্যদিন সন্ত্রাস, খুন, জমি দখল ও মহিলাদের গণধর্ষণ করে আতঙ্কের মাধ্যমে হিন্দুশূন্য

করার গভীর চক্রান্ত চলেছে এবং ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বর্গরাজ্য নির্মাণ করে এলাকা দখলের কাজ চলেছে। তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি যথার্থ বলেছেন, মিটিঙের নামে শাসকদলের অফিসে ডেকে বেছে বেছে হিন্দু মহিলাদের উপর যৌন শোষণ করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে স্বামীদের বলা হয়েছে তাদের স্ত্রী হলেও তাদের কোনো অধিকার নেই। এখানে আরও অভিযোগ উঠেছে এলাকায় শাজাহানদের হুকুমে প্রতিদিন মধ্যযুগীয় বর্বরতায় হিন্দু মায়েদের উপর রাতের অন্ধকারে জঘন্যতম দুষ্কর্ম করার জন্য মধ্য রাতে তুলে আনা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে শাসকদলের মদতে সন্দেশখালিতে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। এই জঘন্য অপরাধের প্রতিবাদে ও শাজাহানের মতো অপরাধীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৪৪ ধারার অজুহাতে ৪০/৫০ কিলোমিটার আগেই বিরোধীদের গ্রেপ্তার করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমনকী বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও সন্দেশখালিতে প্রথমে যেতে দেওয়া হয়নি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালিতে শাজাহানের মতো অপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাননি। তাহলে কি এই রাজ্যে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন কেবলমাত্র শাসকদলের পক্ষে? তফশিলি জাতি ও উপজাতির সর্বভারতীয় চেয়ারম্যান অরুণ হালদার এলাকা পরিদর্শন করে বলেছেন, যেভাবে জনজাতিদের চাষের জমি দখল করতে তাদের উপর অত্যাচার করে যে নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া গেছে, তার প্রেক্ষিতে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারি করে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করেছেন এবং সংবিধানের ৩৩৮ নং ধারায় তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রিপোর্টে জানিয়েছেন।

সন্দেশখালির প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিজেপির পাঁচ জনের মহিলা দলকে এলাকায় পৌঁছাতে দেওয়া হয়নি। তাহলে কি রাতের অন্ধকার মহিলাদের উপর যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন সামনে চলে আসার ভয়? সংসদীয় দলের এলাকা পরিদর্শনে বাধা দেওয়ার কারণ কী?

এবছর টাকিতে শান্তি শৃঙ্খলার অজুহাতে মা সরস্বতীর পূজা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। শোনা যাচ্ছে এই পূজায় নাকি দুধেল গাইয়েরা অসন্তুষ্ট হবে। ভোট বড়ো বালাই! সারা দেশেই হিন্দু দেব-দেবীর পূজা ধুমপানের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের রাজ্যে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করতে গিয়ে হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারে বাধা সৃষ্টি করা হয়। কখনো কখনো আদালতের অনুমতি নিয়ে হিন্দুদের পূজা করতে হয়। তাই দেশে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা নিগৃহীত হন। এই রাজ্যে শাসকদল ভোটের স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা বদলে দিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তুষ্টিকরণের পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু এই ভাবে চলতে থাকলে হিন্দুরা নিজ দেশে পরবাসী হতে সময় লাগবে না। এইভাবে আবার হয়তো গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এবং বীভৎস নোয়াখালি নরসংহারের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে এবং হিন্দুদের পলায়ন ঘটবে। ক্রমশ হিন্দু শূন্য করে এলাকাগুলো এই জেহাদিরা দখল করবে। অচিরে এই সমস্ত এলাকাগুলিতে কাশ্মীরের মতো ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদের আওয়াজ উঠবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই রাজ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি জেলা যেমন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, ২৪ পরগনা ইত্যাদি জেলা ইতিমধ্যে জনসংখ্যায় ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। এমনকী কয়েকটি জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পথে। এদের লক্ষ্য হলো এলাকায় জেহাদি কার্যকলাপ চালিয়ে মাফিয়া ও গুন্ডারাজ কায়েম করে এলাকাগুলি হিন্দুশূন্য করা। এই শাজাহানরাই ভারত থেকে নিত্যদিন সীমান্ত পার করে বেআইনিভাবে বাংলাদেশে গোরু, কয়লা, বালি ও রেশন সামগ্রী পাচার করে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করছে এবং শাসকদলকে অর্থের জোগান দিয়ে চলেছে। সেই অর্থের একটি অংশ নেতাদের হাত দিয়ে বিদেশে গিয়েছে। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে এই মাফিয়ারাই সমান্তরাল অর্থনীতি ও প্রশাসন চালিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছে। এলাকায় জঙ্গলরাজ কায়েম করে লুটেপুটে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

এদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে হিন্দুরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে হিন্দুশূন্য করে এলাকা দখলের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করছে। এছাড়াও রাজ্যের শাসকদলের মদতে বহু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গারা এই রাজ্যে বসবাস করে রাজ্যের অর্থনীতি ও জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা দু' কোটির কাছাকাছি বলে জানা গেছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গারা শাসকদলের বদান্যতায় ভোটার, আধার ও রেশন কার্ড বানিয়ে নাগরিকত্বের দাবি করছে এবং সমস্ত সরকারি সুবিধাও ভোগ করছে। রাজ্যের শাসকদল ভোটার তালিকায় বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম তুলিয়ে ভোটাধিকার প্রদান করে দেশবিরোধী কাজ করছে।

অনেক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সুনিয়োজিতভাবে এই রাজ্যে জমি, বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে যা দেশের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। বাংলাদেশি রোহিঙ্গারাও দেশের অন্য রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করছে এবং সব ধরনের সরকারি সুবিধা ভোগ করছে।

এরা রাজ্যের অর্থনীতি ও রাজস্বে ভাগ বসাচ্ছে এবং এখানে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন ধর্মশালায় পরিণত হয়েছে। সেজন্য অবিলম্বে সিএএ এবং এনআরসি চালু করে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করতে না পারলে দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

সন্দেশখালি কাণ্ডের নেপথ্যে শাসকদলের মদত

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই রাজ্যের সকল মানুষের উপর এসবের মিলিত প্রভাব পড়েছে। এতে সাধারণ শান্তিপ্রিয় ভারতীয় নাগরিক, তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

সন্দেশখালির সন্ত্রাসী শেখ শাজাহান এবং তার দলবলের কীর্তিকলাপ নিয়ে আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশ উত্তাল। এ বিষয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে। এই তথ্য দেওয়ার জন্য নয়, সন্দেশখালি কাণ্ডের পেছনের ঘটনা এবং তার আসল নায়কদের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য এই প্রতিবেদন।

কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের সহাবস্থান বসিরহাট জেলার অন্তর্গত এই সন্দেশখালিতে। এখানে গত ২০ বছরে হিন্দু প্রধান অঞ্চলে ক্রমশ মুসলমানদের বসতি, জমিজমা ও সম্পত্তি বেড়েছে। সিপিএমের তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান নিরাপদ সর্দার বাংলাদেশের এক কলেজ ইউনিয়নের বিএনপির এক ছাত্রনেতা শেখ শাজাহানকে বাংলাদেশ থেকে অসৎ উদ্দেশ্যে সন্দেশখালিতে তার মাসলম্যান হিসেবে নিয়ে এসে এদেশের রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড করিয়ে তাকে পুরোদস্তুর ভারতীয় বানিয়ে দেয়। তখন শেখ শাজাহানের কাজ ছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলবল নিয়ে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে সিপিএম বিরোধী দলগুলিকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে বাধা দেওয়া, ভোটের সময় অল্প যে কটি বুথে নির্বাচন হতো, সেখানে ছাপ্পাভোট দেওয়া, ভোটারদের ভয় দেখানো ইত্যাদি। বিনিময়ে শেখ শাজাহান আর তার দলবলের ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দুদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করা এবং ভেড়ির মাছ, জমির ধান তুলে নেওয়া— এসবের অলিখিত লাইসেন্স দেওয়া হলো!

তারপর ২০১১-তে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ২০১২ থেকে সিপিএমের এই অন্ধকার জগতের মেশিনারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৃণমূল নিজেদের দলে শামিল করে নেয়। সিপিএমের সময় যারা তাদের রিগিং মেশিনারির সম্পদ ছিল, তৃণমূল তাদের দলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করল! এমনকী শেখ শাজাহান, জাহাঙ্গির শেখ, ভাঙড়ের আরাবুল ইসলাম, বীরভূমের কাজল শেখদের দলের নেতৃত্বে বসাল। রাজ্যের পুলিশ দলদাস হিসেবে সরকারি কাজে বেতন নিয়ে এই নেতাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হলো। এদের নির্দিষ্ট এলাকায় এরা মুঘল আমলের জায়গিরদার, মনসবদারের মতো তাদের এলাকা শাসন করতে শুরু করল। এভাবে একদিন সন্দেশখালিতে আইনের শাসনের জায়গায় শাজাহানের শাসন কায়েম হলো। এই মনসবদারদের এলাকায় তৃণমূলের বিরোধী কোনো দলের অস্তিত্ব না থাকায় এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের 'উন্নয়ন' দাঁড়িয়ে থেকে শাজাহান কোম্পানিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করে। লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনে এলাকার ভোটের পরিসংখ্যান বলে, তৃণমূল এখানে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ ভোট পায়!

ধৃত উত্তম সর্দার, তৃণমূলের সন্দেশখালি অঞ্চল সভাপতি

ধৃত শিবু হাজরা, তৃণমূলের সন্দেশখালি-২ ব্লক সভাপতি

পলাতক শেখ শাজাহান
উঃ ২৪ পঃ জেলা পরিষদের নেতা

এভাবে তৃণমূলের ছত্রছায়ায় শেখ শাহজাহান সন্দেশখালিতে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সেই বাংলাদেশের বিএনপি ছাত্রনেতার যে জেহাদি স্বপ্ন, যা এতদিন মনের কোণে সযত্নে লালিত ছিল, সুসময় আসতে সেই স্বপ্নকে সাকার করতে সে মন দিল। মুঘল বাদশাহের বিভিন্ন জায়গিরদার, সুবাদারদের দরবারে যে নিয়ম চালু ছিল— হিন্দু ঘরের কোনো রমণীর বিবাহ হলে প্রথমে তার উপর স্বামীর নয়, বাদশাহের অধিকার থাকে! বাদশাহের মনোরঞ্জনের পর তার স্বামীর সঙ্গে সহবাসের অধিকার মেলে। এভাবে হিন্দু রমণীরা তাদের কাছে 'মালাউন' ও 'গনিমতের মাল' হিসেবে অবশ্য ভোগের সামগ্রী ছিল! শেখ শাজাহান তার দরবারে, পার্টি অফিসে রাত্রে এই প্রথাটাই চালু করেছে! হতভাগী প্রতিবাদীরা পুলিশে অভিযোগ করতে গেলে স্থানীয় থানায় বলা হতো, শেখ শাজাহানের থেকে তাদের বক্তব্য যেন অনুমোদন করিয়ে আনা হয়।

শাজাহানের বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও উঠছে। অদ্ভুত হচ্ছে, উচ্চ-আদালতে ১৪৪ ধারা বাতিলের পর রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পান সন্দেশখালিতে যখন গ্রাউন্ড জিরোতে সংবাদ পরিবেশন করছিলেন, তখন দলদাস রাজ্য পুলিশ তাকে বিনা প্ররোচনায় শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করার জন্য টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করে সন্দেশখালি থানায় নিয়ে যায়। অথচ, উচ্চ-আদালতের নির্দেশের পরেও ৫০ দিন পেরিয়ে গেলেও শেখ শাজাহানকে গ্রেপ্তার করতে পারে না। এর থেকে পরিষ্কার, তৃণমূল সরকারের উচ্চস্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে প্রশাসনের মদতে শাজাহানের দলবল তাদের অত্যাচার-অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা পরিষ্কার হবে।

শাজাহান সাম্রাজ্যের লালনপালনের সুবিধার্থে ২০১৬ ব্যাচের আইপিএস হোসেইন মেহেদি রহমানকে বসিরহাটের এসপি করে আনা হয়। তারপর সম্প্রতি দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় যখন প্রতিবাদী মহিলারা সংবাদমাধ্যমের কাছে তাদের ওপর শাজাহান ও তার দলবলের অত্যাচারের করুণ কাহিনি বর্ণনা করলেন, মমতা ব্যানার্জী পুরো ব্যাপার অস্বীকার করে গণ্ডগোল পাকানোর দায় বিজেপির উপর চাপালেন। সেইসঙ্গে ওই রহমানকে দিয়ে সন্দেশখালির অনেক আগে থেকে রাস্তা সিল করে পুরো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করলেন। উদ্দেশ্য, ব্যাপারটা যাতে জানাজানি না হয় এবং প্রতিবাদীদের শায়েস্তা করা যায়। যখন উচ্চ-আদালতের রায়ে প্রথমবার ১৪৪ ধারা বাতিল হলো, তারপর ১৯টি এলাকায় আবার ১৪৪ ধারা জারি করলেন। শুধু সন্দেশখালিকে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করার উদ্দেশ্যই নয়, এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরগুলি, যারা নিজেদের তৃণমূলেরই সমর্থক বলেছে, চিরতরে বন্ধ করার আয়োজন করা হলো। এ কাজের জন্য আরেকজন আইপিএস পাপিয়া সুলতানকে ওই মহিলাদের নজরে রাখার জন্য পাঠানো হলো।

তারপর রাজ্যের বশংবদ মহিলা কমিশন এবং পরামর্শদাতারা যখন কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের চাপে সন্দেশখালিতে যেতে বাধ্য হলো, তাদের কাছে যে প্রতিবাদী মহিলা মুখ খুললেন, তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হলো। প্রতিবাদী মহিলাদের পুলিশের উপস্থিতিতেই অনবরত ভীতিপ্রদর্শন করা হলো। শেষে যখন পুলিশ শেখ শাজাহানের ঘনিষ্ঠ শাগরেদ উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করল, তখন সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পুলিশ তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গণধর্ষণের অভিযোগ না এনে জামিন যোগ্য ধারা আনল। তখন উত্তম সর্দার সহজেই জামিন পেল এবং প্রতিবাদী মহিলাদের উপর আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ল। এই সময় অভিযোগ উঠল যে, শাজাহানের আরেক শাগরেদ শিবু হাজরার সম্পত্তি পাহারা দিচ্ছে রাজ্য পুলিশ। প্রতিবাদী মহিলারা সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিলেন, 'আমরা সবাই তৃণমূল করি'। সেজন্য যখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০০ টাকা হলো, তখন সেই অজুহাতে পার্টি অফিসে অধিক রাতে সুন্দরী মহিলাদের নিয়ে গিয়ে শেখ শাজাহান ও তার অনুচরদের মনোরঞ্জনে বাধ্য করা হতো। দেশের অন্য কোনো রাজ্য তো দূরের কথা, পৃথিবীতে এমন স্টেট স্পনসর্ড অত্যাচার এই একবিংশ শতাব্দীতে হয়েছে বলে জানা নেই।

শেখ শাজাহানের জেহাদি ছকের আরেকটি তথ্য হলো, উত্তম সর্দারের আসল নাম নূর আলম। এই তথ্য একজন প্রতিবাদী মহিলা প্রকাশ করলেও তার কোনো প্রতিবাদ হয়নি।

পরবর্তী সময়ে রহমানের উপরওয়ালা ডিআইজি সুমিত কুমার যখন শিবু হাজরা ও উত্তম সর্দার ওরফে নূর আলমকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গণধর্ষণের অভিযোগ আনার লিখিত আদেশ দিলেন (যা প্রতিবাদী মহিলাদের বক্তব্য জানার পর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে না করাটা দণ্ডনীয় অপরাধ), তখন রাজ্য প্রশাসন ও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব প্রমাদ গুণলো। রাতারাতি সুমিত কুমারকে নতুন পোস্ট তৈরি করে ডিআইজি, সিকিউরিটি পদে বদলি করা হলো। তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হলো মালদা রেঞ্জের ডিআইজি ভাস্কর মুখার্জীকে। একে নবান্ন সূত্র 'রুটিন বদলি' বললেও তা সত্য নয়, কারণ, সময় অন্য কথা বলছে। ভাস্করবাবু কিছুদিন আগেও বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন। এই সুমিত কুমার মাত্র কয়েকদিন আগে বদলি হয়ে এখানে এসেছিলেন।

এসব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত শাজাহানের সন্দেশখালিকে জেহাদিস্থান বানানোর পরিকল্পনাকেই সমর্থন করেছে। নবান্নের হর্তাকর্তারা যেটা করছেন, তা আগুন নিয়ে খেলা। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে তারা দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপকেই মদত দিচ্ছেন। উত্তম সর্দার না নূর আলম— কোন নামটা সঠিক? কাগজপত্র কী বলছে? শেখ শাজাহান কী করে, কবে, কীভাবে এবং কাদের অনুগ্রহে ভারতীয় নাগরিক হলো? যে দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি এই শেখ শাজাহান, সেই দলের ভূমিকা কী? রাজ্য সরকারি প্রশাসনের ভূমিকাই-বা কী? এসবের দ্রুত যথার্থ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত।

শেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাই। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের জল ও স্থল মিলিয়ে কম-বেশি ২৩৬০ কিলোমিটার সীমানা রয়েছে। এই সীমানার ভিতরে ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গায় বিএসএফ এবং জলপুলিশের টহলদারি এলাকা হলেও এই অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা এবং দোষীদের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা রাজ্য পুলিশের। এই নিয়মে বদল এনে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ কিলোমিটার জায়গায় টহলদারি এলাকা বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করলেও দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নিয়মের চরম বিরোধিতায় শামিল হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই রাজ্যের সকল মানুষের উপর এসবের মিলিত প্রভাব পড়েছে। এতে সাধারণ শান্তিপ্রিয় ভারতীয় নাগরিক, তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হলেই জাতীয় ঐক্যের ভিত মজবুত হবে। ◻

এই সরকার আর নেই দরকার

এমন মা-মাটি-মানুষের সরকার
আর নেই দরকার।
সন্দেশখালি বলছে তাই বারবার।
অন্ধ প্রশাসন, ব্যর্থ পুলিশ,
চারদিকে শুধু নৈরাজ্য আর হাহাকার।
কী দরকার এই সরকার?
মা আজ ধর্ষিতা, মাটি আজ বেদখল,
সরকার মানে শুধু লুটপাট,
চারদিকে শুধু ছারখার,
কী দরকার এই সরকার?
তখন ছিল কথায় কথায় অনশন,
এখন শুধু নাটক আর প্রহসন।
পুলিশ আজ নিরস্ত্র,
মস্তানের হাতে অস্ত্র—
শেখ শাজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার—
রাতের অন্ধকারে হায়নার মতো মা বোনের করে শিকার।
এই সরকার আর নেই দরকার।
শুধু ধিক্কার-ধিক্কার-ধিক্কার
সন্দেশখালি বলছে তাই বারবার।

সুবল সরদার
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

অন্য সমস্যা বা দুর্নীতির বিরুদ্ধেও গর্জে উঠুক কলম

স্বস্তিকা পত্রিকায় বেশ কয়েক বছর ধরে সুন্দর মৌলিক ও নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমি নিয়মিত পড়ি। লেখাগুলো ক্ষুরধার এবং বুদ্ধিদীপ্তও বটে। কিন্তু রান্না যতই সুস্বাদু হোক না কেন, তা অনেক সময় মুখরোচক থাকে না। খাবারের স্বাদ বদলাতে অনেক অনেক সময় বাড়িতে নতুন নতুন পদের রসনাতৃপ্ত খাবার বানাতে হয়। লেখার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। একই ধরনের লেখা পড়তে পড়তে খানিকটা বিরক্তিকর মনে হয়।

নির্মাল্যবাবুর লেখা বৈদ্যুতিন মিডিয়ায় দু-একবার চর্চায় এসেছে। কিন্তু এক ধরনের কথা বারবার লিখলে আমার মনে হয় আমার মতো অনেকেরই বিরক্তিকর মনে হবে।

তাই সুন্দর মৌলিক ও নির্মাল্যবাবুর কাছে অনুরোধ, তাঁদের ক্ষুরধার লেখনি অন্য সমস্যা বা দুর্নীতির বিরুদ্ধেও গর্জে উঠুক।

তারক সাহা
হিন্দমোটর,হুগলী

শেষ দেখতে চায় মানুষ

সন্দেশখালির অভিযোগকারিণীর ছবি জনসমক্ষে প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ আইন লঙ্ঘন করেছে। আসলে এই রাজ্যের পুলিশ আইন অনুযায়ী চলে না। বরং বেআইনি কাজ ও মিথ্যা কেস দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বন্ধু নয়, দুষ্কৃতকারী হিসেবেই পরিচিত হয়েছিল। জাতীয় তপশিলি কমিশনের পর মহিলা কমিশনও এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছে। এই রাজ্যের শাসক দল যেভাবে আচরণ করছে তাতে ওদের কোনো গণতন্ত্র মানা রাজনৈতিক দল বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে প্রচুর হইচই হতে পারে, কিন্তু যেই মুহূর্তে কেন্দ্র ৩৫৬ প্রয়োগ করবে, ঠিক সেই সময় থেকেই কংগ্রেস, সিপিএম-সহ সব দল রে-রে করে উঠবে। সুতরাং মুখে বলা সহজ, করে দেখানো যথেষ্ট কঠিন।

পুলিশ আজ তৃণমূলের ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে পড়েছে, কিন্তু তারপরও ওদের প্রকাশিত ভিডিয়ো থেকে যা উঠে এসেছে তা ওদের দেউলিয়াপনাই জানান দিচ্ছে। স্থানীয় নেতৃত্ব বলছেন সাধারণ মানুষকে, আপনাদের ক্ষতি পূরণ করে দিলে আপনারা তৃণমূলকে সমর্থন করবেন তো? যদিও সরকার পক্ষ থেকে মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনৈতিক। যেভাবে ক্যামেরার সামনে সরকারি প্রকল্পের টাকা পর্যন্ত লুঠের অভিযোগ তুলেছেন সাধারণ মানুষ, তাতে দু-কান কাটা বলেই তৃণমূল মুখ দেখাতে পারছে। এখনও পর্যন্ত শাজাহান অধরা। শাজাহান রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতা বলেই অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের ব্যর্থতা নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবেই শাজাহানকে ধরছে না সেটা নিয়েও সন্দেহ বাড়ছে। তৃণমূল সরকার যতই শাজাহানকে বাঁচানোর চেষ্টা করুক সফল হবে না। আদালতে রাজ্য যেভাবে হেনস্থা হচ্ছে তাতে রাজ্যবাসী হিসাবে লজ্জিত বোধ করছি। শুভেন্দু অধিকারী সাম্প্রতিক সন্দেশখালি যাওয়ায় মানুষ আরও সাহস পেয়েছে। শেষ দেখতে চায় রাজ্যের মানুষ।

শঙ্কর মণ্ডল,
উলুবেড়িয়া, হাওড়া

শ্রীরাম নামের মাহাত্ম্যে জেগে উঠেছে হিন্দু সমাজ

এখন দেশময় আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনার ভক্তিময় পরিবেশ। হবে নাই-বা কেন? দীর্ঘ ৫০০ বছর অসংখ্য সংগ্রাম, বলিদান, লড়াইয়ের পর গৃহহীন শ্রীরামলালা পুনরায় নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শুধু ভারত নয়, বিশ্বজুড়ে হিন্দুরা অধীর আগ্রহে শ্রীরাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের শুভ মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছেন। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম নামের মাহাত্ম্যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে

জেগে উঠেছে আপামর ভারতবাসী। আজ সমগ্র ভারত শ্রীরামময়। লক্ষ লক্ষ মানুষের গন্তব্যস্থল অযোধ্যা। সকলেই অযোধ্যায় যেতে চান, শ্রীরামলালাকে প্রাণ ভরে দেখতে চান। শ্রীরামমন্দির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে দেশে অভূতপূর্ব ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীরাম ও কৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণুর এই দুই অবতার সমগ্র ভারতের ঐকের প্রতীক। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, কলা সর্বত্রই রয়েছেন শ্রীরাম। উত্তরে যারা রামধারী, সীতারাম, রামকৃপাল, রামপ্রবেশ, পূর্বে তারাই রামকৃষ্ণ, রামকুমার, রামমোহন। আবার দক্ষিণে যদি রামারাও, রামচন্দ্রন, রামাইয়া, রামমূর্তি, সীতারামাইয়া, পশ্চিমে তারা রামাবতার, রামস্বরূপ, রামধন, রামভাই। মধ্যভারতে আবার রামনাথ, রামলাল, রামকমল। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই কোটি কোটি মানুষ শ্রীরাম নামে আবদ্ধ। ভারতবর্ষের বিবিধ ভাষা শিক্ষার প্রায় সর্বত্রই প্রথম পুরুষ রূপে ব্যবহৃত হয় শ্রীরামের নাম। রামনবমী, দশেরা, রামলীলা, রামায়ণ গান, রামপাঁচালি, কীর্তন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই। বাঙালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপূজার মূলে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধন। বিধর্মীদের অত্যাচার প্রতিরোধে শ্রীচৈতন্য রামনামের মাধ্যমেই হিন্দু সমাজকে একত্রিত করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানেই রাম-সীতার বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীরাম-সীতা মাতার নামে অসংখ্য তীর্থক্ষেত্র রয়েছে, মন্দির রয়েছে। সংস্কৃতে মূল বাল্মীকি রামায়ণ তো বটেই, বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় রচিত হয়েছে রামায়ণ। হিন্দিতে রামচরিত মানস--- লেখক তুলসীদাস/ অন্ধ্রপ্রদেশে রঙ্গনাথন রামায়নম্— গোনাবুড্ডা রেড্ডি/ কেরলে আধ্যাত্মরামায়ণম্ কিল্লিপ্পট্টু— থুনচাথ্যু এযুথাচন/ অসমে কথা রামায়ণ— গিরধারা গোস্বামী/ কর্ণাটকে কুমুডেনণ্ডু রামায়ণা, তামিলনাড়ুতে কম্ব রামায়ণম্---কম্ব/ কাশ্মীরে রামাবতার চরিত/ ওড়িশায় ডাণ্ডি রামায়ণ— বলরাম দাস/ মহারাষ্ট্রে ভাবার্থ রামায়ণ— সন্ত একনাথ ছাড়াও একই ভাষায় আরও অনেক রামায়ণ স্থানীয় লোকাচার, সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে রচিত। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ভারতে ভাষা, বর্ণ, পন্থ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রই শ্রীরামসম্পৃক্ত। শ্রীরামচন্দ্র, যার পরম মিত্র ছিলেন নিষাদরাজ গুহক, শ্রীরামচন্দ্র যিনি জনজাতি, উপজাতি, অন্ত্যজ শ্রেণীর সকলকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। শবরীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেছিলেন রামচন্দ্র। ধর্ম অধর্মের লড়াইয়ে আর্যাবর্তের উত্তর থেকে দক্ষিণে এভাবেই শক্তি ও ভক্তির সংমিশ্রণে এক সমরসতা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম, ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাপলক। আজও কল্যাণকারী আদর্শ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে রামরাজ্যের তুলনা করা হয়। শ্রীরাম শুধু ভারতের নন, বিদেশেও যেমন শ্রীলঙ্কা, নেপাল, লাওস, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইনস, মরিসাস, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া— সর্বত্রই শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত, বন্দনীয়। অথচ ভারতের এই পরম শ্রদ্ধেয় প্রাণপুরুষের জন্মস্থান দীর্ঘকাল অবহেলিত থেকেছে। বিধর্মী বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি ১৫২৮ সালে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের উপর নির্মিত মন্দিরটি ভেঙে মসজিদের রূপ দিয়েছিল। মন্দির পুনরুদ্ধারের লড়াই তখন থেকেই শুরু হয়। অনেক সংগ্রাম, বলিদানের সাক্ষী থেকেছে সরযূ নদী। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বহু অনুসন্ধান এবং অত্যাধুনিক স্ক্যানে ধাঁচাটির নীচে মন্দিরের যাবতীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর ধান্ধাবাজ রাজনীতিক আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল দীর্ঘদিন তারস্বরে কুম্ভীরশ্রু বিসর্জন করে হাত-পা ছুঁড়েছেন, প্রলাপ বকেছেন। ওই স্থানে মসজিদ প্রমাণের কুযুক্তি দিয়ে পছন্দের পত্রিকায় একের পর এক হিন্দু সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ করে গেছেন। বিশেষ করে কমিউনিস্টরা একের পর এক ন্যারেটিভ তৈরি করেছেন। শ্রীরামকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। ছড়া কেটেছেন, হনুমানের দল বলে বলেছেন।

যদিও তাতে রামমন্দির নির্মাণ বিন্দুমাত্র আকটায়নি। কিন্তু এইসব রাজনৈতিক নেতা এবং সামাজিক এলিটরা, রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমশ অপ্রঙ্গিক হয়ে উঠেছে, গুরুত্ব হারিয়েছে। রামলাল পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তৈরি হয়েছে ইতিহাস। সূচনা হয়েছে নতুন দিশার। এগিয়ে চলেছে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্বের দিকে।

মন্দার গোস্বামী
ঈশ্বরবাবুর গলি

With Best Compliments from -

A
Well Wither

লক্ষ্যভেদে অবিচল ভারতীয় মহিলারা

নিবেদিতা কর

দু' হাজার কুড়ি সালের টোকিয়োতে অলিম্পিক গেমসে ভারত মোট ৭টি পদ জয় করে এবং বিশ্বে ৪৮তম স্থান দখল করে। ৭টির মধ্যে মহিলারা এনেছিলেন তিনটি পদক। মহিলা বক্সিঙে লাভলিনা বরগোঁহাই ৬৪-৬৯ বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছিলেন, মীরাবাঈ চানু ৪৯ কেজি মহিলাদের ভরোত্তোলন বিভাগে রৌপপদক লাভ লাভ করেন এবং পিভি সিন্ধু মহিলাদের সিঙ্গেলস ব্যাডমিন্ট বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

২০২৩ সলের এশিয়াডে ভারত থেকে হানঝাউতে গিয়েছিলেন মোট ৬৬১ জন অ্যাথলিট। তার মধ্যে পুরুষ ৩৩৫ জন এবং মহিলা ৩২৬ জন। এশিয়াডে ভারত মোট পদক জিতেছে ১০৭টি। যার মধ্যে রয়েছে ২৮টি সোনা। ৩৮টি রুপো এবং ৪১টি ব্রোঞ্জ। পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত। ভারতের হয়ে যেসব মহিলা খেলোয়াড় সোনা জিতেছেন তাদের অবদান হলো— তিরন্দাজি-মহিলাদের দলগত ইভেন্টে। জ্যোতি, প্রণীত, অদিতি, মিক্সড দলগত ইভেন্টে জ্যোতি ওজস। অ্যাথলেটিকসে ৫০০০ মিটারে, পারুল চৌধুরী। জ্যাভলিন থ্রোয়ে অন্নু রানি। মহিলা ক্রিকেট দল, কবাডি মহিলা দল, শ্যুটিং-১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে— পালাক, স্কোয়াশ মিক্সড ডাবলসে দীপিকা পাল্লিকাল, হরিন্দর পাল। ইকুয়েস্ট্রিয়ান ড্রেসেজ টিম বিভাগে দিব্যাকৃতি সিংহ ও সুদীপ্ত হাগেলা।

যাঁরা রৌপ্য পদক জিতেছেন অ্যাথলেটিক্সে ১০০ মিটার হার্ডলস —জ্যোতি ইয়ারাজি। ১৫০০ মিটার— হার্মিলন বাইনস। ৩ হাজার মিটার স্টেপলচেস— পারুল চৌধুরী। ৪ × ৪০০ রিলে— বিদ্যা রামরাজ, ঐশ্বর্য মিশ্রা , প্রাচী, শুভ বেঙ্কটেশন। ৮০০ মিটার— হার্মিলন বাইনস। লং জাম্প-অ্যান্সি সজল। ৪ × ৪০০ মিক্সড রিলে মহম্মদ আজমল, বিদ্যা রামরাজ, রাজেশ। বক্সিং— ৬৬-৭৫ কেজি— লভলিনা বরগোহাঁই। দাবা— হাম্পি, হরিকা, বনিতা, সবিতা। গল্ফ— মহিলাদের ব্যক্তিগত ইভেন্ট— অদিতি অশোক। শ্যুটিং—১০ মিটার এয়ার পিস্তল দলগত ইভেন্ট— পলক, এষা সিংহ, দিব্যা। শ্যুটিং— ১০ মিটার পিস্তল— এষা সিংহ। সেইলিং ILCA4- হো ঠাকুর। উশু— মহিলাদের ৬০ কেজি— নাওরেম রশিবিনা দেবি। শুটিং—১০ মিটার এয়ার রাইফেল মহিলা দল— সিপত কৌর, আশি চৌসকি, মানিনি। শ্যুটিং--ট্র্যাপ টিম --মহিলা দল-- প্রীতি রজক, রাজেশ্বরী, মানিন। শ্যুটিং—১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড ইভেন্ট— দিব্যা সর্বজিৎ।

যারা ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন তাদের অবদান— তিরন্দাজি— ব্যক্তিগত ইভেন্টে অদিতি স্বামী মহিলাদের দলগত ইভেন্টে অঙ্কিতা ভকত, ভজন কৌর, সিমরনজিৎ কৌর। অ্যাথলেটিক্স ৩ হাজার মিটার স্টেপলচেসে প্রীতি লাম্বা। ৪০০ মিটার হার্ডলসে বিদ্যা রামরাজ। ডিসকাস থ্রোতে সিমা পুনিয়া। হেপটাথন নন্দিনী আগাসারা। শট পার্ট— কিরণ বালিয়া। ৩৫ কিলোমিটার হাঁটা মিক্সড দল— রামবাবু, মঞ্জুরানি। হকি— মহিলা দল। বক্সিং— ৪৫-৫০ কেজি— নিখাত জারিন, ৫০-৫৪ কেজি— প্রীতি, ৫৪-৫৭ কেজি— প্রবীণ। রোলার স্কেটিং-- ৩০০ মিটার রিলে-- সঞ্জনা বথুলা, কার্তিকা হিরাল, কস্তুরী রাজ। সেপাক তাকরাও-- মহিলা দল। কুস্তি-- ৫৩ কেজি--অন্তিম পাঙ্ঘাল, ৭৬ কেজি— কিরণ, ৬২ কেজি—সোনম। স্কোয়াশ-মিক্সড ডাবলস— অভয় সিংহ, আনাহত সিংহ। মহিলাদের দল— দীপিকা পাল্লিকাল, আনাহত সিংহ। টেবিল টেনিস মহিলাদের ডাবলসে সুতীর্থা মুখেপাধ্যায়, ঐহিকা মুখোপাধ্যায়।

২০২০-তে অলিম্পিকে ভারতীয় ভারতীয় মহিলারা যেমন পারফরমেন্স রেখেছেন ২০২৩ সালে ভারতীয় মহিলারা আরও অনেক গুণ এগিয়ে এশিয়াডে দুর্দান্ত কেন্দ্রীয় খেলে ভারতকে এতগুলি পদক এনে দিয়েছেন। নতুন আঙ্গিকে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতীয় খেল নীতির প্রণয়নের ফলে এবং ভারতীয় নারীদের খেল মন্ত্রক বিভিন্ন সুবিধা ও পরিকাঠামো দিলে তারা দেশের জন্য জান লড়িয়ে পদক আনতে পিছিয়ে থাকবেন না তার জলজ্যান্ত উদাহরণ আমরা পেয়ে গেছি। বাঙ্গালি হিসেবে আমি বিশেষ করে গর্বিত যে নৈহাটির মেয়ে ঐহিকা মুখোপাধ্যায় এশিয়াডে দুর্দান্ত সফলতার পর অর্জুন পুরস্কারের মতো জাতীয় সম্মানে সম্মানিত হন এবং গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে বিশ্ব টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচেই বিশ্বের এক নম্বর তারকা চীনের সুন ইঙ্গসাকে হারিয়ে দিয়েছেন। এরকম লজ্জার হার চীনের টেবিল টেনিস ইতিহাসে এই প্রথমবার ঘটেছে বঙ্গ তনয়ার কাছে। ▫

আত্মহত্যার ইচ্ছা একটি রোগ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

যদি কারও মনে আত্মহত্যা করার চিন্তা আসে তাহলে তা নিজের মনে গুমরে না রেখে কাউকে বলে ফেলুন। অনেক সময় নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছা না করলে বন্ধুস্থানীয় কারুর কাছেও বলতে পারেন। এতে কিন্তু হতাশা কিছুটা হলেও কমে যায়। একই সঙ্গে যিনি শুনলেন তিনিও তৎপর হয়ে বাড়ির বাকি লোকেদের সতর্ক করতে পারেন। কারও মনের এই অবস্থা যখন টের পাবেন তখন তাঁকে বলুন, 'কেমন আছো?' অনেকের ধারণা, আত্মহত্যার কথা সেই ব্যক্তিকে বারবার জিজ্ঞাসা করা হলে হয়তো তাঁর মনে সেটাই সারাক্ষণ ঘুরপাক খাবে। তাই এ নিয়ে কথাবার্তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান– এ ধারণা ভুল। বরং তাঁর সঙ্গে কথা বলে বোঝান যে আপনি তাঁর কষ্ট, সমস্যাটা বুঝতে পারছেন। তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন না। তাঁর সমস্যা শুধু বোঝার চেষ্টা করুন। তাঁকে গুরুত্ব দিন। এতে আত্মহত্যার ইচ্ছাটা কমে যাবে।

আত্মহত্যার চেষ্টা করার পরে বা যে ব্যক্তির মধ্যে হাই সুইসাইডাল রিস্ক আছে, তার উপরে কড়া নজর রাখতে হবে পরিবারের সদস্যদের। একই সঙ্গে দ্রুত মনোবিদের কাছে নিয়ে গিয়ে কাউন্সেলিং করাতে হবে। বাড়ির দু'জন লোক সব সময় ওই ব্যক্তির সঙ্গে থাকুন। এমন প্রিয়জনরা থাকুন যাঁর সঙ্গে সে তার চিন্তাভাবনা শেয়ার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাড়ির সব দরজা, বাথরুমের ছিটকিনি খুলে রাখতে হবে, যাতে ভিতর থেকে নিজেকে বন্দি করে রাখতে না পারে। ওই ব্যক্তির হাতের কাছে ধারালো বস্তু, দড়ি বা আঘাত লাগলে ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু রাখবেন না। ছাদ বা এমন কোনো জায়গা থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেদিকে যেতে দেবেন না। তাকে চুপচাপ বসিয়ে না রেখে যে কোনো কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। খেয়াল রাখুন, সে যেন কখনোই একা হয়ে গিয়ে আত্মহত্যার কথা ভাববার অবকাশ না পায়। কাউন্সেলিঙের সময় ডাক্তার ও বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের বলতে হবে– 'সব শেষ হয়ে যায়নি। এই দুঃসময়টা কেটে যাবে। আবার ভালো সময় আসবে। তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে'। সাধারণত এই সময় আত্মহত্যা প্রয়াসীদের মনে হয়, 'আমার জীবন এত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে যে, আমি আর কোনোভাবেই বাঁচতে চাইছি না'। এই প্রসঙ্গে তাঁকে বোঝাতে হবে, 'এই মুহূর্তটা টেম্পোরারি বা ক্ষণস্থায়ী। সময়টা ঠিক কেটে যাবে। সবাই পাশে আছে। তার জন্য এমন কোনো সিদ্ধান্ত যেন না নেয়'। বলতে হবে যে, 'সুইসাইডের চিন্তা যে কারও মাথায় আসতে পারে। এটা মোটেই লজ্জাজনক নয়। তাই এসব ভেবে কুঁকড়ে যাওয়ার কিছু নেই। বরং নতুন উদ্যমে জীবনযাপন করুন'। খুব যখন অস্থির হয়ে পড়বে তখন ডাক্তারের পরামর্শ মতো তাঁকে কিছু ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে। এতে উদ্দীপ্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। মানসিক অবসাদও লাঘব হয়।

কতদিন ঘেরাটোপে

ন্যাশনাল মেন্টাল সার্ভে নামক একটি জাতীয় সমীক্ষা বলছে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় বেশি সুইসাইডের ঘটনা ঘটে। টিনএজ ছেলে-মেয়ে থেকে ৩০ বছর বয়সি এবং যাটোর্ধ্ব প্রৌঢ়দের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। এছাড়া হঠাৎ আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে, সংসার ভেঙে গেলে, একাকী থাকলে, হঠাৎ সংসারে গুরুত্ব কমে গেলে, অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হলে, মদ-ড্রাগসের মারাত্মক নেশা থাকলে সুইসাইড করার ঘটনা ঘটে।

আত্মহত্যা কি রোগ?

এতদিন বলা হতো, আত্মহত্যা একটা লক্ষণ। কোনো অসুখ নয়। কিন্তু এখন এই ধারণায় বদল এসেছে। আমেরিকার ডেভিড শিহান নানা উদাহরণ তুলে ধরে আত্মহত্যাকে রোগ বলেই দাবি করছেন। তাঁর এই দাবিকে মান্যতা দিয়েছেন বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্টরাও। তাঁদের মতে, আত্মহত্যা বা তার চেষ্টার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে একে শুধু ডিপ্রেশনের একটি লক্ষণ বলা ভুল। আবার আত্মহত্যার ইচ্ছার প্রথম ধাপের লক্ষণ হলো, যেখানে রোগী ভাবেন, আমি নিজে সক্রিয় হয়ে কিছু করব না, মৃত্যু চলে এলে ভালো হয়। দ্বিতীয় ধাপে রোগী ঠিক করে নেন তিনি কীভাবে মরতে চান। কিংবা কীভাবে মরলে ভালো হয় এবং সেটা রিসার্চ করা, প্ল্যান করা। তারপর অ্যাকশন ও চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই ধরনের আত্মহত্যা প্রবণ রোগী বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সব পরিকল্পনা করে রাখেন। কোন জায়গায় কখন সুইসাইড করবেন, সব ঠিক করা থাকে। এমনকী সেই স্থানে ওই সময় গিয়ে একাধিকবার দেখেও আসেন। আর এক ধরনের হয়, যেখানে হঠাৎ কোনো আবেগ থেকে আচমকা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। একে ইম্পালসিভ সুইসাইড বলে। এই ধরনের লক্ষণগুলিকে এখন ডিসঅর্ডার বলে ধরা হয়।

কেন মেট্রোয় বেশি ঝাঁপ

মেট্রোয় ঝাঁপ, রেললাইনে দেহ, সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলন্ত দেহ, বিষ খেয়ে আত্মঘাতী, বহুতল থেকে লাফ— খবরের কাগজ, খবরের চ্যানেলে এমন খবর বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকাশ করলে আত্মহত্যার কথা ভাবছেন যেসব মানুষ, তাঁরা প্রেরণা পান। প্রতিদিনই বহু মানুষ নানা কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছেন। এঁদের অনেকের মাথাতেই সুইসাইডের কথা ঘুরছে। তাই মেট্রোয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার কোনো ঘটনা ঘটলে এবং তা কাগজে বিশদে দেখলে তারা সেই পথ অনুকরণ করে। ভেবে নেয়, ওই ব্যক্তি দিব্যি সফল হয়েছে, তাহলে সে নিজেও হবে। একে মডেলিং বলে। এই মেথডের জন্যই যে সপ্তাহে মেট্রোয় ঝাঁপের ঘটনা ঘটে, সেই সপ্তাহে আরও একাধিক এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই মিডিয়াকে এক্ষেত্রে খুব সতর্ক ভূমিকা পালন করতে হবে। বেশ কিছু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশে শিশু ও টিনএজারদের আত্মহত্যার খবর করা নিষিদ্ধ। কারণ এই বয়সিদের মধ্যে অনুকরণের প্রবণতা বেশি। □

রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে তৃণমূলের মৃত্যুঘণ্টা বাজালো সন্দেশখালি

বিশ্বপ্রিয় দাস

এখন সারা ভারতের রাজনৈতিক আবর্ত যেন পশ্চিমবঙ্গের একটি বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে। নানা বিষয়ের মাঝখানে উঠে আসছে ভয়ংকর সব তথ্য। নারী নির্যাতনের ইতিহাসটা বোধহয় উত্তর চব্বিশ পরগনার এই খাল-বিল বেষ্টিত তপশিলি জাতি-উপজাতি প্রধান এলাকাটিকে শতাব্দীর সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করবে। ইতিমধ্যেই নানা সংবাদমাধ্যমে সবাই দেখেছেন, শুনেছেন, সংবাদপত্রে পড়েছেন। ফলে সেই ঘটনার বিশদে আর না যাওয়াই ভালো। তবে এখানকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিতে সামান্য হলেও নজর দিতে হবে। ১৯৫১ সালের প্রথম নির্বাচন হয় প্রায় দ্বীপাঞ্চলের এই অংশে। কংগ্রেস জিতেছিল এই আসনটি। এরপর ওই বছরেই এই আসনের দখল চলে যায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। ১৯৬৯ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তাঁদের হাতেই থাকে এই অঞ্চল। মধ্যে নির্দল ও কংগ্রেস এসেছিল। ২০১১ সালে এই আসনটি সংরক্ষিত হয় তপশিলি উপজাতিদের জন্য।

এলাকাটি কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি বলে ধরা হতো এক সময়ে। ২০১১ সালে নিরাপদ সর্দার জেতেন এই আসনে। মাত্র ৩ শতাংশের ব্যবধান ছিল। পরের নির্বাচনে কমিউনিস্টদের হারাতে হয় আসনটি। দখল নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৬ ও ২০২১-এর নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে জেতে তৃণমূল কংগ্রেস। সুকুমার মাহাতো প্রায় ৫৫ শতাংশ ভোট পায় শেষ নির্বাচনে। দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। তারা পায় ৩৫ শতাংশ ভোট। আর বামেরা মিলিত ভাবে পায় মাত্র ৭ শতাংশ। ফলে বোঝাই যাচ্ছে রাজ্যের শাসক দলের প্রভাব কতটা এই আসনে। সেখানে বাহুবলীদের দাপট সেটা অকল্পনীয় হয়ে ওঠে গত আট বছরে। এই বাহুবলী আর কেউ নয়, ২০০৯ সাল পর্যন্ত বামপন্থী ছত্রছায়ায় থাকা শেখ শাজাহান। যখন শাজাহান বুঝতে পারে যে তৃণমূল কংগ্রেস আসার পর পায়ের তলার মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। সে তৃণমূলে যোগ দেয়। তৃণমূলে যোগ দেবার পর তৃণমূলের প্রভাব প্রখর করার দায়িত্ব নেয় শাজাহান ও তাঁর বাহিনী।

সন্দেশখালির অবস্থানগত দিক দিয়ে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এটি ভারত ও বাংলাদেশ জলসীমার একেবারে কাছাকাছি। সুন্দরবনের মধ্যে থাকা এই অঞ্চলের গুরুত্ব পাচারকারীদের কাছে মুক্তাঞ্চল। উত্তর চব্বিশ পরগনার এই অঞ্চলগুলি দিয়ে নিশ্চিন্তে মাদক থেকে মানব পাচার করা যায় নির্বিঘ্নে। এলাকায় উড়তে থাকা অর্থ ধরার জন্য ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে। ফলে এলাকার দখলদারি যার হাতে থাকবে, সেই এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠবে। শেখ শাজাহানের উত্থান কিন্তু এভাবেই। এলাকাকে দখলে রাখতে তারা প্রান্তিক এলাকাটাকে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিল। শিবু হাজরা বা উত্তম সর্দাররা মূল বাহুবলীর শাগরেদ হবার কারণে, আর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় শাসক দলকে একেবারে মাথায় পাওয়ায় এই শিবু বা উত্তম নিজের নিজের রাজত্ব তৈরি করতে থাকে। একদিকে যেমন সম্পত্তি গ্রাস করার নেশা, অন্যদিকে মহিলাদের নানা ভাবে নিজেদের লালসার শিকার করার লোভ এদের মজ্জায় ঢুকে পড়ে। ভয়ে ও আতঙ্কে নিরীহ গ্রামের মেয়েরা এদের সেই চাহিদা মেটাতে থাকে। স্বামী ও সন্তানদের রক্ষা করতে তারা এদের বিছানো জালে ধরা পড়ে। যে জমির চাষের ফসলের ওপর নির্ভর করে মানুষগুলো বেঁচে থাকত, সেই জমিগুলো নানা ভাবে দখল করে নেয় উত্তম ও শিবু বাহিনী।

মমতা ব্যানার্জীর সরকারের কাছে যদি বলা যায়, এই বিষয়গুলি অজানা, তাহলে বলা হবে যারা বলেছেন, তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। দেখেও না দেখার ভান, জেনেও না জানার ভান করার চেষ্টার একমাত্র কারণ হলো, এই এলাকা থেকে বিশাল পরিমাণ অর্থের জোগান ও দুষ্কৃতী আমদানি। যারা নানা কুকর্ম করে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে। এমনটাই বলছে স্থানীয় মানুষ ও রাজনৈতিক মহল। উত্তর চব্বিশ পরগনা হচ্ছে মানব পাচারের এক বড়ো ঘাঁটি। বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চল। এখানে বহু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে, যারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এই পাচার রোধে। একদিকে সুন্দরবন অঞ্চলের মুক্ত জলসীমানা অন্যদিকে বনগাঁ থেকে করিমপুর পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ অসংরক্ষিত সীমান্ত। ফলে এই অঞ্চলের দখলদারীর জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত রাজ্যের শাসক দল। তাই যখন এখানে জনরোষ আছড়ে পড়ল, সেই সময় মূল পাণ্ডাকে রক্ষা করার দায়িত্ব বকলমে নিতেই হলো শাসক দলকে। এই জনরোষ কারোর উসকানিতে হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী যতই গা বাঁচানোর জন্য বলুন। ইডি যখন শেখ শাজাহানের বাড়িতে হানা দিল। শাজাহান পালিয়ে গেল। সেই সময়েই জনরোষের আগুন জ্বলে উঠল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষগুলো রুখে দাঁড়াল। নেতৃত্ব দিলেন অত্যাচারিত মহিলারা। প্রায় পুরুষ শূন্য গ্রামগুলিতে রুখে দাঁড়ালেন অসংখ্য দুর্গা। তাঁদের হুংকারে শাসক দলের আসন আজ টলোমলো। এই সন্দেশখালিই বর্তমান শাসক দলের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে দিল। শেষে একটি কথা বলতেই হচ্ছে, শাসক দলের এক মুখপাত্র, যিনি পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। একটি মামলায় পুলিশের হাতে বন্দি হবার সময়, এক মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে আদর্শের বাণী বিতরণ করে বলেছিলেন, তাঁর সুপ্রিমো, মুখ্যমন্ত্রী সব জানেন। বর্তমানে তিনি ও তাঁর মতো একদল পদলেহনকারী সাংবাদিক এটাকে নাটক আখ্যা দিচ্ছেন। এই জন অভ্যুত্থানের পিছনে তিনি নাকি খুঁজে পেয়েছেন সঙ্ঘ-বিজেপি সমেত নানা যোগ। তাঁদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলার আছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার পথ দেখালেন উত্তর চব্বিশ পরগনার এক অখ্যাত গ্রামের মায়েরা। সেইসঙ্গে সারা রাজ্যে শাসক দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস। আর রাজ্যের শাসক দল, যে দল ইতিমধ্যেই নানা দুর্নীতির পাপের ফাঁসে হাঁসফাঁস করছে তাদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেল এই ছোট্ট একফালি গ্রাম থেকেই।

সন্দেশখালিতে চলছে বিচ্ছিন্নতাবাদের তৃতীয় ধাপ

দীপ্তাস্য যশ

নেটফ্লিক্সে অত্যন্ত জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ছিল পাবলো এস্কোবারের উপরে তৈরি হওয়া নারকোস। সেখানে আমরা দেখেছিলাম পাবলো এস্কোবার চেয়েছিল সে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হবে এবং তারপর কলম্বিয়াকে নারকো স্টেটে পরিণত করবে।

পাবলো এস্কোবার কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে পারেনি, কিন্তু হলে কী হতো তা বোধহয় আজকের পশ্চিমবঙ্গ দেখে বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে যা চলছে তা কোনো রাজনৈতিক লড়াই নয়। এটা পুরো সুন্দরবন অঞ্চলের জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে ভারতীয় সংবিধানের আওতার বাইরে রাখার কর্মসূচি। হ্যাঁ, কর্মসূচি, কোনো সাধারণ চক্রান্ত নয়। সন্দেশখালি সেই চক্রান্তের তৃতীয় ধাপ।

কোনো জায়গাকে যদি কোনো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় তাহলে তার পাঁচটি ধাপ থাকে। প্রথম ধাপ, সংখ্যা বাড়ানো। দ্বিতীয় ধাপ জমি দখল এবং অর্থনীতির ক্ষতিসাধন। তৃতীয় ধাপ সামাজিক সন্ত্রাস আর চতুর্থ ধাপ বিচ্ছিন্নতাবাদ। কীভাবে একটা ধাপ থেকে আরেকটা ধাপে উত্তরণ ঘটে এবং কীভাবে ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিতে থাকে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই সুন্দরবন অঞ্চল। সন্দেশখালি সুন্দরবনের একটি অঞ্চল যার কথা আমরা আজ সমগ্র দেশ জানতে পেরেছে। কিন্তু এরকম আরও কত কত সন্দেশখালি সুন্দরবনে আছে আমরা তা জানিও না।

প্রথম ধাপে সুন্দরবন অঞ্চল যে দুই জেলার মধ্যে বিস্তৃত অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনা, সেই দুই জেলায় জনসংখ্যার ভারসাম্যে কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে তা কয়েকটি তথ্য দেখলেই বোঝা যায়।

১৯৮১ থেকে ২০১১-এর মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সবসময়েই প্রায় দুই শতাংশের আশেপাশে। এমনকী ১৯৯১ সালে এই বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৬৮ শতাংশ। যা কিনা ১৯৭১ সালে যখন বহু সংখ্যক হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই সময়েও ২.৯৯ শতাংশ ছিল। এমনকী দেশভাগ পরবর্তী সময়ে ১৯৫১ সালেও তা ১.৯৯ শতাংশ ছিল।

আরও আছে মজার তথ্য। ১৯৯১ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬৮ শতাংশ। কিন্তু ওই দশকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার crude death rate সবসময়েই দুই শতাংশের আশেপাশে, আর TFR গড়ে দুই শতাংশের আশেপাশে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অঙ্কের কোনো হিসেবেই আসছে না। একই ছবি উত্তর চব্বিশ পরগনাতেও। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবসময়েই দুই শতাংশের বেশ খানিক উপরে। অথচ TFR ১.৫ শতাংশেরও নীচে। যা কিনা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন জেলাগুলির মধ্যে একটি। আর death rate ৫.৮ শতাংশ।

২০১১ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেগঙ্গায় ভোটার বেড়েছে প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি। বাদুড়িয়ার প্রায় ৫০ হাজার। ২০০৯ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে বসিরহাট লোকসভায় ভোটার বেড়েছে প্রায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। একইভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড় বিধানসভায় ভোটার বেড়েছে প্রায় ৬০ হাজার। জয়নগর, মগরাহাট এইসব বিধানসভাতেও ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় একই। অধিকাংশ জায়গাগুলিতেই হিন্দুরা গত এক দশকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

অনুপ্রবেশ যে হচ্ছে তা এইসব তথ্যগুলি

দেখলেই বোঝা যায়। উত্তর চব্বিশ পরগনার দশটি ব্লকে এখন হিন্দুরা গুরুতর ভাবে সংখ্যালঘু। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় হিন্দু জনসংখ্যা ১৯৪১ সালের ৭০ শতাংশের তুলনায় বর্তমানে ৬৩ শতাংশ। আর মুসলমান জনসংখ্যার ১৯৪১ সালের ২৮ শতাংশের তুলনায় এখন ৩৬ শতাংশের কাছাকাছি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মোটামুটি ভাবে ষোলটি ব্লকে এখন হিন্দুরা সংখ্যালঘু। এই যে পরিসংখ্যান এ শুধুমাত্রই সরকারি পরিসংখ্যান, এর বাইরেও যে কত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আছে সে হিসেব কোনো সরকারি খাতায় নেই।

প্রথম ধাপে এভাবেই ১৯৮০ সাল থেকে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তারপর ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়েছে জমি দখল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে অপারেশান বর্গা হয়। এর ফলে ভূমিহীন চাষিরা জমি পায়, কিন্তু একই সঙ্গে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ কৃষি থেকে তাদের আয় কমে যাওয়ার ফলে তারা অন্য জীবিকার খোঁজে ক্রমশ গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। ৯০-এর দশকের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রায় দুর্লভ হয়ে পড়ে। এই সময়েই শুরু হয় জমি দখল। প্রথমে যেখানে সম্ভব সেখানে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জমি কিনে নেওয়া হয়। আবার সন্দেশখালির মতো যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু এবং হিন্দু জনগোষ্ঠী বলতে মূলত জনজাতি সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র মানুষ সেখানে রাজনৈতিক পরিচয়কে হাতিয়ার করে তাদের জমি হাতিয়ে নেওয়া হয়। খেয়াল করুন, সন্দেশখালিতে অভিযোগ কিন্তু শুধুমাত্র মহিলাদের উপরে অত্যাচার নয়। অভিযোগ জমি দখলেরও। খেয়াল করুন, এই শেখ শাজাহানের উত্থান কিন্তু তৃণমূল আমলে নয়, তার উত্থান বাম আমলে। রাজনীতি এদের কাছে জামার মতোই। রাজনীতি আসলে এদের মুখোশ। রাজনীতির আড়ালে চলছে বিচ্ছিন্নতাবাদ।

একবার যখন শেখ শাজাহানরা প্রথম দুই ধাপ পার করে ফেলে, তারপর আসে সন্দেশখালি অর্থাৎ তৃতীয় ধাপ।

সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকাই জনজাতি অধ্যুষিত। বংশপরম্পরায় এদের জীবিকা ছিল কৃষি, মাছধরা বা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ। সুন্দরবনের মতো অঞ্চলে মধুসংগ্রহ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা। সুন্দরবনে বেশ কিছু এরকম গ্রাম আছে যেখানে বিধবারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কারণ সেইসব গ্রামের পুরুষরা মধু সংগ্রহে গিয়ে বা বনাঞ্চলের নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বাঘ বা কুমিরের শিকার হয়েছেন। ফলে ক্রমশ তারা সেই জীবিকা থেকে সরে আসছেন এবং তারা বিকল্প জীবিকা হিসেবে কৃষি বা মৎস্য চাষকে বেছে নিয়েছেন।

খেয়াল করে দেখুন, সন্দেশখালিতে যেমন মহিলাদের উপরে অত্যাচারের অভিযোগ আছে, ঠিক তেমনই অভিযোগ জমি দখল আর ভেড়ি দখলের। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা পতিত, অনুর্বর জমিতে মাছচাষের জন্য ভেড়ি করেছিলেন, সেই ভেড়ি আজ শেখ শাজাহানদের দখলে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নোনা জলও ছেড়ে দেওয়া হয়, ফলে তারা চাষাবাদ করতে পারে না।

এমতাবস্থায় খুবই স্বাভাবিক যে পুরুষরা জীবিকার জন্য নিজ ভূমি ছেড়ে অন্যত্র পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে যেতে বাধ্য হবেন। গ্রামে থেকে যাবে শুধুমাত্র মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধরা। ঠিক তাই হচ্ছে সন্দেশখালিতে। সেই কারণেই আন্দোলনের মুখ মহিলারা, কারণ গ্রামের পুরুষরা বেশিরভাগই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্য রাজ্যে কাজে চলে গেছেন। এই পরিস্থিতিই মজিদ মাস্টার, ইচ্ছা লস্কর, শেখ শাজাহানরা তৈরি করতে চেয়েছে। সন্দেশখালির মহিলারা কিন্তু এমনও অভিযোগ করছেন তাদের বারো-চোদ্দ

বছরের ছেলেদের স্কুলে পড়তে যেতে দিতেও নানারকম বাধার সৃষ্টি করে শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারের দলবল। তাদের এদের বাগান বাড়িতে, চাষের জমিতে, মাছের ভেড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো হয়। অর্থাৎ শিক্ষার বিস্তার ঘটতে না দেওয়া যাতে সমাজের কোমর ভেঙে যায়। এর সঙ্গেই চূড়ান্ত সন্ত্রাস হিসেবে আছে মহিলাদের উপরে আক্রমণ।

ভাবুন, যে মহিলার স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে অন্য কোনো রাজ্যে কাজ করছেন, যে মহিলা জানেন যে তার উপরে অত্যাচার হলেও তিনি কোথাও অভিযোগ জানাতে পারবেন না, তিনি ঠিক কতখানি সন্ত্রস্ত হবেন। মনে করুন, আন্দোলনের একদম প্রথম দিকেই মহিলারা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন শেখ শাজাহান আর তার দলবলের আক্রমণের লক্ষ্য কিন্তু শুধুমাত্র, শুধুমাত্রই হিন্দু মহিলারা। কারণ মহিলাদের উপরে অত্যাচার সমাজকে সন্ত্রস্ত করার সব থেকে বড়ো হাতিয়ার। দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানেও একই ঘটনা ঘটেছে, তারপরেও বারে বারে পূর্ণিমা শীলদের উপরেই আক্রমণ হয়েছে এবং আজকের সন্দেশখালিতেও একই অভিযোগ উঠছে।

ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যাবে, ১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগ হয় তখন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বেশিরভাগই কিন্তু ছিল সেখানকার মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়। উদ্বাস্তুদের মূল ঢল কিন্তু নামে ১৯৫০ সালে যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মেয়েদের উপরে অত্যাচার শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গেও বিগত এক দশকে বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বোধহয় একটি দিনও যায়নি যেখানে কোনো না কোনো নিম্নবর্ণের হিন্দু ঘরের মেয়ের সঙ্গে কিছু না কিছু ঘটেছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, দুই চব্বিশ পরগনায় এ যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ পুলিশ, প্রশাসন কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। কেন?

কারণ এই অরাজক পরিস্থিতি, আইন শৃঙ্খলার দুর্দশা এও আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদেরই একটি হাতিয়ার। মানুষ যখন দেখবে তার ঘরের নারী আক্রান্ত, পুলিশ প্রশাসন কেউ তার সহায় নয়, তখন তার কাছে কী করার থাকে? একটাই পথ, এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যাওয়া যেখানে সে সংখ্যালঘু নয়। ঠিক তাই হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ, মালদায় আজ হিন্দু সংখ্যালঘু। দুই দিনাজপুর, দুই চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলও একই দিকে এগোচ্ছে। আপনারা হয়তো বলবেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়ছে না কেন?

পূর্ব পাকিস্তানেও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা লড়াই দিয়েছিল, কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন সরকারের মদত পায়, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যখন শাসকদলের আশ্রয় পায়, তখন একটা পর্যায়ের পরে লড়াই চালানো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আজকের সন্দেশখালিতেও ঠিক তাই হচ্ছে। যেখানে শেখ শাজাহানের বিরুদ্ধে এতো অভিযোগ, অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছেন, 'শেখ শাজাহানকে টার্গেট করা হচ্ছে', তারপরে সাধারণ মানুষ কোথায় ভরসা পাবে? লড়াইয়ের মনোবল কীভাবে পাবে? ঠাণ্ডা ঘরে বসে আমি আপনি অনেক কথাই বলতে পারি, কিন্তু বাস্তব অত্যন্ত কঠিন।

এই যে মহিলাদের উপরে অত্যাচার, এই যে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, এসবই আসলে একটা পদ্ধতি— বিচ্ছিন্নতাবাদকে ছড়িয়ে দিয়ে দেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পদ্ধতি। সন্দেশখালি সেই প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপে পৌঁছে গেছে। কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ চলছে। কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ক্রমশ পরিবর্তিত জনবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখুন, বুঝে যাবেন। আর এইসবই হচ্ছে সরাসরি সরকারি মদতে। সেই কারণেই লেখার শুরুতেই পাবলো এস্কোবারের কথা টেনেছি, কিন্তু পাবলো এস্কোবারও এদের কাছে নেহাতই শিশু। সে শুধুমাত্র কোকেন বেচত, আর এখানে হেন কোনো বেআইনি কাজ নেই যা হয় না।

নারীপাচার আজ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বড়ো সমস্যা। বস্তুত নারীপাচারে পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারতের মধ্যে এগিয়ে। সুন্দরবন অঞ্চল এই নারীপাচারের অন্যতম কেন্দ্র। এতটাই ভয়ংকর যে তৃণমূলের এক বিধায়ক তার পরিচালিত সিনেমাতেও তা দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। এর সঙ্গেই আছে আরও নানাবিধ পাচার— সোনা, অস্ত্র, ড্রাগ, এমনকী বোধহয় মানব দেহের অঙ্গও। আর সেই পাচারকে নিয়ন্ত্রণ করছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ প্রশাসন এই শেখ শাজাহান, জাহাঙ্গিরদের মাধ্যমে। এদের প্রতিটি কার্যকলাপ সরকারি মদতপুষ্ট।

কলম্বিয়ার ভাগ্য ভালো ছিল সেখানে পাবলো এস্কোবার রাষ্ট্রপতি হতে পারেনি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য বোধহয় অতটা সুপ্রসন্ন নয়, আগামীদিনে সেই ভবিতব্যের কোনো পরিবর্তন হবে কিনা তা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকেই ঠিক করতে হবে। তাদেরই ভাবতে হবে কীভাবে তারা নিজেদের জমি রক্ষা করবে, কীভাবে তারা নিজেদের নারীদের রক্ষা করবে। নাকি আরও একবার উদ্বাস্তু হবে। ■

বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের একাদশতম প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহ

গত ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের গণপতি নগরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে একদশতম প্রাদেশিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হলো। ২৭ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

যাঁদের গৌরবময় উপস্থিতি প্রান্ত ক্রীড়া সমারোহের গরিমা বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁরা হলেন— মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক পূজ্যপাদ স্বামী জয়েশানন্দ মহারাজ, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদ শ্রীমতী ইতি বর্মন, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সম্পাদক তপন কুমার ভড়, প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহ সমিতির সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র প্রধান, প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহ সমিতির যুগ্ম সম্পাদক কনক কুমার পাণিগ্রাহী ও বিশ্বম্ভর ঘোষ এবং বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের সহ খেলকুদ প্রমুখ তপন কুমার দাস। মাতৃবন্দনার মাধ্যমে একাদশতম প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহের আনুষ্ঠানিক সুচনা হয়। স্বামী জয়েশানন্দ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। পরিষদের পতাকা উত্তোলন ও জ্যোতি প্রজ্বলন করেন শ্রীমতী ইতি বর্মন। সেই জ্যোতি বহন করে মাঠ পরিক্রমা শুরু করে সারদা বিদ্যামন্দির, যমুনাবালী, মেদিনীপুরের বোন অন্বেষা ব্যানার্জী। শপথবাক্য পাঠ করান সারদা বিদ্যামন্দির (ইংরেজি মাধ্যম), রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুরের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ও এসজিএফআই-এর ২০২৪ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বালক বিভাগের ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় রৌপ্য পদক প্রাপ্ত সফল ক্রীড়াবিদ্ বিশ্বরূপ মণ্ডল। তাকে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে মানপত্র ও পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সুন্দর শারীরিক কার্যক্রম ও নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থাপন করে সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দিরের, গণপতিগর, মেদিনীপুরের ভাই-বোনেরা। মহারাজ বৈদিক ক্রীড়া উদ্‌ঘাটন মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে একাদশতম ক্রীড়া সমারোহ শুরু করেন।

প্রাদেশিক ক্রীড়া সংযোজক বাবলু মণ্ডল তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, 'দক্ষিণবঙ্গের ১১টি জেলা থেকে ৯০ জন ভাই, ৭০ জন বোন, ৪২ জন আচার্য, ২৫ জন আচার্যা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপক-সহ প্রায় ২৩২ জন উপস্থিত ছিলেন। ৩৭ জন বিচারকমণ্ডলীকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা ক্রীড়া সুষ্ঠু ও সফল করার জন্য তিনি সাধুবাদ জানান। এই সমারোহটিকে সফল ও সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য প্রায় ৪০ জন আচার্য-আচার্যা ও স্থানীয় কার্যকর্তাকেও তিনি ধন্যবাদ জানান।

শিশু বিভাগে ৫ জন এক সঙ্গে সেরা বোন নির্বাচিত হয়— কুমারী অনুষ্কা সাঁতরা, শ্রেয়সী মিশ্র, পল্লবী রায়, বিনিতা রায় ও শ্রেয়ভী ঘোষ। সেরা ভাই শ্রীমান সায়ন গরাই, সরস্বতী শিশু মন্দির, বনপাটনা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

বালক বিভাগে সেরা বোন— কুমারী সৃজিতা মণ্ডল, সারদা বিদ্যামন্দির, যমুনাবালী, মেদিনীপুর। সেরা ভাই সৌমিক পাল, সারদা বিদ্যামন্দির, যমুনাবালী, মেদিনীপুর।

কিশোর বিভাগে সেরা বোন— কুমারী অন্বেষা ব্যানার্জী, সারদা বিদ্যামন্দির, যমুনাবালী, মেদিনীপুর। সেরা ভাই যুগ্মভাবে শ্রীমান অরিজিৎ সরকার, লাধুরাম তোষনিওয়াল সারদা বিদ্যামন্দির, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ ও শ্রীমান আদিত্য সিংহ, সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দির, গণপতিনগর, মেদিনীপুর।

তরুণ বিভাগে সেরা সেরা ভাই শ্রীমান সৌমিত্র পাল, সারদা বিদ্যামন্দির, যমুনাবালী, মেদিনীপুর।

শিশু বিভাগের প্রাপ্ত পুরস্কারের নিরিখে এবারও সেরা জেলা হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে ঘোষণা করা হয়।

কৃতী ভাই-বোনেদের পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র এবং অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রতিযোগীকে স্মারক প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এবারের প্রদত্ত স্মারকটিতে তিরন্দাজি বিভাগে অর্জুন পুরস্কার ও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শীতল দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। সমাপন বক্তব্য রাখেন সৌমেন খাঁন, পৌরপ্রধান, মেদিনীপুর পৌরসভা। তিনি বলেন— 'শিশুমন্দিরগুলি তথা বিদ্যাভারতী শিক্ষাক্ষেত্রে ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সমাজের সামনে সাফল্যের এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিকের গুরুত্ব যে অপরিসীম তার উল্লেখও করেন। প্রতিযোগীদের সাহস ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিশুমন্দিরের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি শিশুমন্দিরকে তার পরিবারের অংশ বলে উল্লেখ করেন। প্রয়োজনে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।' রাষ্ট্রবন্দনা ও পতাকা অবতরণের মাধ্যমে একাদশতম প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহের সমাপ্তি ঘটে।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দ সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

গত ৪ ফেব্রুয়ারি বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে বেহালা শরৎ সদন প্রেক্ষাগৃহে শ্রীঅরবিন্দ সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের আয়োজন করা হয়। বন্দেমাতরম সংগীতের পরেই পাঠচক্রের তরুণ সদস্যদের সমবেত কণ্ঠে প্রদীপ প্রজ্বলন একক প্রচেষ্টায় রাসবিহারী এভিনিউয়ের পথপার্শ্বে বঙ্গের সশস্ত্র বিশেষত অখ্যাত বিপ্লবীদের কর্মকৃত জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিশিষ্ট অতিথিদের ভাষণ। স্বামী

মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতমাতা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন বিশিষ্ট অতিথিগণ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দ মহারাজ, ওভারম্যান ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি অনুরাগ ব্যানার্জি এবং ম্যাকাউট (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর অধ্যাপক ড. শ্রিয়ংকর আচার্য। উত্তরীয়, উপহার স্মারক , ব্যাজ ও পুষ্পস্তবক দিয়ে অতিথিগণকে বরণ করেন পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ, সহসভাপতি নিমাইচাঁদ দত্ত এবং শ্রীমতী ঋতা চ্যাটার্জি। অতিথিগণের পরিচয় প্রদান করেন পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে 'বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ' গানের ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে পাঠচক্রের আদর্শ। বন্দেমাতরম ও বিবেকানন্দ গীত পরিবেশন করেন শ্রাবণী ব্যানার্জী এবং তাঁর সহ শিল্পীবৃন্দ। এরপর অতিথিবৃন্দ পাঠচক্রের স্মারক পত্রিকা 'মাভৈ'-এর উন্মোচন করেন। পাঠচক্রের রীতি অনুসারে এবছর কালীঘাট এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী কাশীনাথ ব্যানার্জীকে মানপত্র, উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দ মহারাজ। উল্লেখ্য, কাশীনাথ ব্যানার্জীর বিশ্বাদ্যানন্দ মহারাজ তাঁর ভাষণে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের অপরিসীম প্রভাবের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন। জাতীয় আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূকিার কথা সুন্দর ভাষায় উপস্থাপন করেন অনুরাগ ব্যানার্জী। ড. শ্রিয়ংকর আচার্য অসাধারণ স্তোত্রপাঠ, গান ও বাচনভঙ্গির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের জীবন ব্যাখ্যা করেন।

অনুষ্ঠানে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল শ্রীঅরবিন্দ কেন্দ্র উত্তর কলকাতা পরিবেশিত, সন্দীপ মজুমদার পরিচালিত গীতিআলেখ্য 'শ্রীঅরবিন্দ লহ প্রণাম'। ১৫জন শিল্পী সমন্বয়ে সংগীত ও গ্রন্থনার অপূর্ব মেলবন্ধনে নিবেদিত গীতিআলেখ্যে শ্রীঅরবিন্দ প্রণতি সুষমামণ্ডিত চিত্রগীতিতে পরিণত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পাঠচক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রাক্তন সভাপতির নামে 'অলোকবরণ চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান। পুরস্কার হিসেবে শংসাপত্র, পুস্তক ও প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিচারক অসিত ভট্টাচার্য ও নম্রতা টোডীকেও সংবর্ধনা জানানো হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কুমারী দেবলীনা চক্রবর্তী।

হুগলীতে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের আলোচনা সভা

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে, হুগলী জেলার পোলবা-দাদপুর খণ্ডের পোলবা মণ্ডলের 'কুটিরবাগান' নামক স্থানে নারীশক্তির জাগরণের জন্য একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা-সহ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কার্যক্রমে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় মহিলা প্রমুখ সুশ্রী বীণাপাণি দাসশর্মা এবং কলকাতা মানিকতলা নগর মহিলা সভানেত্রী শ্রীমতী দীপালি মুর্মু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বনবাসীনৃত্য-সহ অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। অতিথিগণ দীপ প্রজ্বলন এবং প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন দ্বারা কার্যক্রমের শুভারম্ভ করেন। পরিবেশিত হয় বালিকাদের দ্বারা সমবেত নৃত্য, গীত এবং সুশ্রী বীণাপাণি দাসশর্মা কর্তৃক দেশের

স্বাধীনতার জন্য জনজাতি নারীশক্তির গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ। তিনি নারীশক্তির সশক্তিকরণের জন্য সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন সকলকে স্বাবলম্বন, নিজ দেশ, ধর্ম এবং সংস্কৃতি রক্ষণের জন্য ঐকান্তিক আহ্বান জানান। কার্যক্রম ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং প্রাঞ্জল, সর্বোপরি অত্যন্ত উৎসাহপূর্ণ।

বহরমপুর নগর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বার্ষিক বনভোজন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বহরমপুর নগর সমিতির উদ্যোগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় মধুপুর কালীবাড়ি সংলগ্ন মাঠে এক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। বনভোজনে পরিষদ কার্যকর্তা, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী মিলিয়ে ২০০ জন অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে মা কালীর পূজার ফোঁটা দেওয়া হয়। পরে পরিষদের রীতি অনুসারে প্রদীপ প্রজ্বলন ও মঙ্গলাচরণ করে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। জেলা সৎসঙ্গ প্রমুখ বিবেকানন্দ মণ্ডল মঙ্গলাচরণ করেন। সমবেত হনুমান চালিশা পাঠ, দেশভক্তিমূলক গানের পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌতম সরকার ভাষণ রাখেন। ভাষণে তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চার ধরনের কাজ যথা, আন্দোলন, জনজাগরণ, সেবা ও সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বনভোজনের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে দুপুরে সবাই সহভোজনে মিলিত হন। শেষে জেলা সভাপতি কৃষ্ণেন্দু সরকার পরিষদের প্রতিষ্ঠা ও কাজ সম্পর্কে স্বল্প কথায় ভাষণ রাখেন।

সভা সঞ্চালন করেন জেলা সমরসতা প্রমুখ সন্তোষ রজক। কার্যালয় প্রমুখ জয়ন্ত দাস বনভোজনের ব্যবস্থা দেখভাল করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নগর সম্পাদক দেবাশিস দত্ত।

ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সঙ্ঘ মলয়নগর শাখার শুভারম্ভ

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা মলয়নগর বাইপাস শাখার উদ্বোধন করা হয়। ষাট সদস্যের শাখা অফিসটি উদ্বোধন করেন বিএমএস-এর ত্রিপুরা রাজ্য মহামন্ত্রী তপন দেব। অখিল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কার্যকর্তা শ্রীমতী রুমা সাহা সংগঠনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তৃতা করেন। শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বক্তৃতা করেন বিএমএস (ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সঙ্ঘের) ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি অরুণাভ দত্ত (রজত দত্ত)। উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রবীণ নাগরিক রঞ্জিত দাস।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজীর প্রতিকৃতিতে উপস্থিত সকলে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। বাবুল ঘোষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা ত্রিপুরায় শ্রমিক কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার মজদুর সঙ্ঘের চারশো সদস্য রয়েছে। এই সভায় সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। টিঙ্কু দাসকে প্রেসিডেন্ট, নিখিল কুন্দকে সেক্রেটারি এবং বলাই দাসকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

পুরী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি পুরী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দিরে সঙ্ঘ প্রকাশিত দু'টি পুস্তক—'শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ চালিশা' ও 'শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ অষ্টোত্তর শতনাম' বিমোচন করেন পুরী জগন্নাথ মন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি রামচন্দ্র দাস মহাপাত্র। উপস্থিত ছিলেন ওড়িশা রেসলিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সচিব সন্তোষ কুমার মহাপাত্র, পুরী ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সচিব রসময় প্রতিহারী, পুরী শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক প্রভাকর মহাপাত্র এবং কুরুক্ষেত্র ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী পুরী ও স্বামী তারানন্দজী।

ধর্ম জিজ্ঞাসা—ষোলো

আপন সাধনায় ব্যক্তিই হলো ‘পরম’ পুরুষ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

তারপর?...

এ এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। সব জানার পরও আরও জানার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। যেন মিছরির রুটি। বারবার লেহনের পরও আবার সেটা ফের চেটে দেখার ইচ্ছা। শেষে নেই তো আরও মিষ্টত্ব!

অনেকটা মৃতদেহ ময়নাতদন্তর মতো। মৃত্যুর কারণটা হয়তো জানা। তবুও আইনি নিদানে শবব্যবচ্ছেদ। কাটা ছেঁড়ার মধ্য দিয়ে জানা মৃত্যুর কারণটা ছিল কী?

সত্যের ক্ষেত্রেও ঘটে সেটাই। চরমে পৌঁছবার পরও প্রশ্ন, তারপর? আধুনিক বিজ্ঞানও বলে সে কথাই। সত্যের পরেও হয়তো আছে আরও কোনো সত্য, যা এখনও রয়েছে জানার বাইরে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানেও প্রতিধ্বনি সেই কথারই। পরম সত্যে পৌঁছবার পরও সংশয়। এই কি শেষ কথা? আর কি কিছুই নেই? ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তাই বলেন, এই পর্যন্তই আমার জানা। এটাই পরম সত্য। এর পরের কথা জানা নেই। মনে করি এর পরে আর কিছু নেই। বলারও নেই আর কিছু।

এই হলো প্রকৃত জ্ঞানীর উপলব্ধি। জ্ঞানের গভীরে যাওয়ার পরও বিনয়, কেবল এটুকুই জানি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের কথা—অপার জ্ঞানসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে সামান্য কয়েকটি নুড়ি আমার সংগ্রহ। আরও কত-কত আছে জানার বাকি!

হিন্দুধর্মে এই জানা এবং জানানোর প্রশ্নেই ওঠে অধিকারের কথা। সব কিছু জানার অধিকার বা প্রস্তুতি নেই সকলের মধ্যে। বলার ক্ষেত্রেও রয়েছে ওই একই বাধা। তাই আগে চাই প্রস্তুতি। অর্জন করতে হয় অধিকার। তারপর সাধনা। গুরু ও শিষ্য দুজনেরই।

প্রশ্ন এখানেও। ঈশ্বরই তো সব কিছু স্রষ্টা। তাহলে তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন এই বৈষম্য? ভূমিষ্ঠ হবার পর তো সকলেরই একই রকম হওয়ার কথা! তা হয় না কেন?

বিজ্ঞানের কথা, বংশাণু বা জিনই বহন করে জীবনের বৈশিষ্ট্য। সেকারণেই বিভিন্ন পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

মন ভরে না এই উত্তরেও। তাই যদি হয়, তাহলে একই পিতা-মাতার সন্তানদের ক্ষেত্রেও কেন ঘটে মেধার তারতম্য। কেন সকলে নয় একই মেধার আধার?

এখানেই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা আর ভারতধর্মের বক্তব্যের মধ্যে দেখা যায় পার্থক্য। এখানেই আসে প্রারব্ধ বা জন্মান্তরবাদের কথা। হিন্দুধর্মের কথা, বংশাণু বা জিনের কারণে একই বংশ বা যুগের সন্তানদের মধ্যে দেখা যায় কিন্তু সাধারণ সাদৃশ্য। কিন্তু বিগত জন্মের সাধনা বা কর্মের ফলেই এই জন্মের সাধনা বা কর্মের সূচনা। বলা হয়, কোনো সাধক বিগত জন্মে যে কোনো কারণেই হোক, সাধনা যদি সম্পূর্ণ করতে না পারেন তাহলে পরজন্মে তাঁর সাধনা শুরু হয় তারপর থেকে। জন্মান্তরের দুঃখ ভোগ যেমন নির্দিষ্ট একইভাবে সুখের ভাগও থাকে সুনিশ্চিত।

বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বলা হয়, বিগত জন্মে কেউ যদি সাধনায় মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। তাহলে পরজন্মে তাঁর সাধনা শুরু হয় তার পর থেকে। অন্যদিকে যিনি যে জন্মে সাধনার মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হতে পারেননি, তাঁর সাধনার শুরুটা হয় সেখান থেকে। সে কারণেই সহোদর ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে দেখা যায় মেধার পার্থক্য। ভাই-বোনদের মধ্যে কেউ এগিয়ে যায় জীবন পথের দৌড়ে, কেউ থাকে পিছিয়ে।

এ সবের সারকথা, কর্মফল অনুযায়ীই ইহজন্মে মানুষের কর্মসাধনার শুরু। জন্মান্তরের ওপার থেকে বয়ে আনা কড়ির মূল্যেই এইজন্মে জ্ঞান ও সাধনার কাজে প্রবেশের অধিকার পায় মানুষ। সেই অধিকারকে সুন্দরভাবে কাজে

লাগাতে পারেন যাঁরা তাঁরাই হন সফল-সিদ্ধ। জন্মান্তরের সুফল সঙ্গী না হওয়ার কারণেই অনেকে বহুশাস্ত্র পাঠে পাণ্ডিত্য অর্জনের পরও থেকে যায় অন্ধকারেই। অবশ্য সদ্‌গুরুর কৃপা পেলে তার মধ্য দিয়েই তিনি তৈরি করেন আগামী জন্মের সত্য সুন্দরের পথ।

কেমন করে– তার কিছুটা অনুমান করা যায়, পিপ্পলাদ ঋষির কাছে তাঁর ছয় তরুণ শিষ্যের জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তর পাওয়ার কাহিনি বা ঘটনা থেকে।

আচার্য পিপ্পলাদ। মহাসাধক। সাধনার মাধ্যমে তিনি হয়েছেন ব্রহ্মবিদ। শাস্ত্রের কথা, ব্রহ্মকে যাঁরা জানেন, তাঁরা নিজেরাই ব্রহ্ম হয়ে যান। অর্থাৎ ব্রহ্মের পরমসত্তায় লীন হয়ে তাঁরা হন ব্রহ্মময়।

এমনই ব্রহ্মবিদ আচার্য পিপ্পলাদের আশ্রমে সেদিন এলেন ছ'টি তরুণ। বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ ও জিজ্ঞাসু। জ্ঞানের ঔদ্ধত্য নয়, হাতে সমিধ নিয়ে বিনত মস্তকে এলেন দৃঢ় তরুণ—ভরদ্বাজ তনয় সুকেশা, শিবি-পুত্র সত্যকাম, গর্গগোত্রের সৌর্যায়নী অশ্বলের পুত্র কৌসল্য, বিদর্ভের ভৃগুর আত্মজ ভার্গব এবং কাত্য-নন্দন কবন্ধী। ছ'জনেই ছিলেন ব্রহ্মে সমর্পিত প্রাণ। ব্রহ্মকে পরমভাবে জানার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা এসেছেন পিপ্পলাদ আশ্রমে। সগুণ ব্রহ্মের কথা জানলেও নির্গুণ ব্রহ্মকে জানার জন্য তাঁরা শরণাগত হলেন আচার্য পিপ্পলাদের।

আচার্য তাঁদের দেখলেন। দেখার মধ্য দিয়েই যাচাই করে নিলেন তাঁদের সামর্থ্য। বুঝলেন, প্রত্যেকেই ওরা পরমজ্ঞান লাভের অধিকারী। তবুও আরও সুনিশ্চিত হওয়ার জন্যই বললেন, এক বছর আমার সঙ্গে থাক। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান ও সুস্থির হয়ে কৃচ্ছসাধন ও সংযম অভ্যাস কর। তারপর তোমাদের যার যা প্রশ্ন আছে আমি তার যথাসাধ্য উত্তর দেব। যতটুকু আমার জানা তার সবটুকুই দেব তোমাদের। জেনে রাখো, আমার যদি জানা থাকে, তাহলে তা গোপন করব না তা। কেনই-বা করবো– জানো তো, বিদ্যাধন—সদা বর্ধমান—যতই দান করবে ততই বৃদ্ধি পাবে তা। সেই জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনো বাসনা আমার নেই। নিশ্চিত থেকো একবছর বাদে আমি তোমাদের প্রশ্নের ক্ষুধা অবশ্যই মিটিয়ে দেব।

একটি বছর গুরুগৃহে অন্তেবাসী হয়ে ওই ছয় তরুণ কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে নিজেদের তৈরি করলেন। তারপর এলেন গুরু সান্নিধ্যে। আচার্য পিপ্পলাদ দেখলেন, এই একটি বছরের ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিটি শিষ্য হয়ে উঠেছেন আরও তেজোময়, আরও বিনম্র, নির্গুণ ব্রহ্মকে জানার বা তাঁর কথা শোনার জন্য উপযুক্ত করেছেন ছয় তরুণই নিজেদের সবরকমেই।

দেখে প্রীত হলেন পিপ্পলাদ। তারপর শান্ত ধীর কণ্ঠে বলেন, এবার বলো—বলো তোমাদের প্রশ্ন—যা উতলা করেছে তোমাদের হৃদয়কে।

আচার্য পিপ্পলাদের একথার পর বিনম্র কণ্ঠে তাঁর শিষ্য ছয় তরুণ এক এক করে বলেন তাঁদের মনের কথা। তাঁদের দ্বিধা ও জিজ্ঞাসার কথা। সুকেশা ছাড়া বাকি পাঁচজন যে সব প্রশ্ন করেন তা সরাসরি ব্রহ্ম সম্পর্কে নয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়েও তাঁরা কেন এমন প্রশ্ন করলেন তা নিয়ে কথা উঠতেই পারে।

উত্তরে বলা যায়, সরাসরি ব্রহ্ম সম্পর্কিত না হলেও সেসব প্রশ্নের কোনোটিই অপ্রাসঙ্গিকও নয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নই ছিল ব্রহ্মকে জানার এক একটি ধাপ। প্রশ্নগুলির বেশিরভাগই ছিল প্রাণ নিয়ে। এবং সেটাই বোধহয় সঙ্গত। কেননা, এই দৃশ্যমান জগতের সব কিছুর মূলেই রয়েছে প্রাণ। কত বৈচিত্র্য—কিন্তু সব কিছুর পিছনেই সক্রিয় একটি মূল কারণ। সেই কারণ অন্বেষণে অগ্রসর হয়ে প্রথমে তাকে খোঁজা হয় বাইরে। তারপর একসময় দৃষ্টি ফেরে নিজের দিকেই। এবং তখনই হয় চরম উপলব্ধি যা আছে বাইরে, তা-ই রয়েছে অন্তরেও। যখন বাইরে তখন বা বিশ্ব বা সমষ্টি আর অর্ন্তদর্শনে তাই-ই জীব বা ব্যষ্টি। এই জীব এবং অনন্ত সত্তা এক এবং অভিন্ন। এই যে সিদ্ধান্ত তাকেই শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিকরা অভিহিত করেছেন অদ্বৈততত্ত্ব বলে। এই তত্ত্ব-ই জীবকে করে আত্মস্থ।

এসব তো হলো দার্শনিকতার কথা। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে আবার বরং শোনা যাক আচার্য পিপ্পলাদের তরুণ সেই পঞ্চশিষ্যের প্রশ্নগুলি।

আচার্য পিপ্পলাদের শিষ্যরা সকলেই ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান। তাই কোনো অবান্তর প্রশ্ন করে গুরুর বিরক্তির কারণ হননি তাঁরা। তাঁদের প্রশ্নগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এর মধ্য দিয়ে কোনো প্রশ্নকর্তার মনের দ্বন্দ্ব, দ্বিধা বা জানার ইচ্ছাই প্রকাশ পায়নি, বরং এমনই প্রশ্নের কাঁটার খোঁচায় যে অসংখ্য মানুষ অবিরত বিক্ষত হচ্ছেন তাঁদের চিত্তের সেই ব্যাকুলতারও প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ, প্রশ্নকর্তা ব্যক্তিবিশিষ হলেও তার মধ্যে ধ্বনিত বিশ্বজনের জিজ্ঞাসা। তাই এগুলির মধ্যে রয়েছে একটা বিশ্বজনীন বোধের প্রকাশ।

তাঁদের প্রশ্নগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেকের প্রশ্নের মধ্যেই ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও ঝিলিক।

তাঁদের প্রশ্ন, কোথা থেকে এসেছি আমরা? এই যে জীবন, তার উৎস কী? আমাদের কাছে নিত্য প্রকাশমান এই জগৎকে কোন ইন্দ্রিয় তুলে ধরে? সেই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রধান কোনটি? প্রাণ বা প্রাণবায়ুর উৎপত্তি হয় কোথা থেকে? কীভাবে প্রাণ এই জীব শরীরে প্রবেশ করে এবং কীভাবেই-বা তা একসময় এই শরীরকে ত্যাগ করে? কে ঘুমিয়ে থাকে আর কেই-বা জাগ্রত? স্বপ্নের সময় কী ঘটে? আনন্দের উৎস কী? 'ওম্' এই মহামন্ত্র ধ্যান করলে মানুষ কোথায় যায় এবং কীই-বা লাভ করে? সব শেষে ছিল পিপ্পালাদের ষষ্ঠ শিষ্য সুকেশার প্রশ্ন,

পরম সত্তা কী? তিনি আছেন কোথায়?

প্রশ্নের মতোই আচার্য পিপ্পলাদের উত্তরগুলিও ছিল, অবান্তর কথার মেদহীন—সংক্ষিপ্ত, সরল ও যথাযথ। প্রায় এক কথাতেই তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞসার উত্তর দিয়েছেন। যেখানে যতটুকু ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল বোঝার সুবিধার জন্য, তার বাইরে একটি কথাও খরচ করেননি আচার্য। এক্ষেত্রে তাঁকে কথা-কৃপণ বলে মনে হলেও তিনি জানেন, অতি কথাতে কেবল ধোঁয়াশাই সৃষ্টি হয়, আসল অর্থটি যায় গুলিয়ে, দৃশ্যমান বস্তুও চাপা পড়ে অদৃশ্য-র ধুলিজালে। তাই তিনি উত্তর দিয়েছেন একবারে সরাসরি।

তিনি বলেছেন, অন্নই প্রজাপতি। অন্নই প্রাণের বীজ এবং সেই বীজ থেকেই জন্ম সমস্ত প্রাণীর। বলেন জগতে যা কিছু আছে তার নিয়ন্তা প্রাণ। প্রাণই প্রজাপতি—সবকিছুর উৎস। এই প্রাণ আসে পরমাত্মা থেকে। বাসনা পূরণের জন্যই প্রাণ উপযুক্ত শরীর গ্রহণ করে তার বিভিন্ন অংশে নিজেকে স্থাপিত করে। বস্তুত প্রাণ হলো আত্মারই বিকার। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন জীবাত্মা এবং ইন্দ্রিয়গুলি অক্ষর পরমাত্মায় বিশ্রাম করে। জাগ্রত অবস্থাতেও ব্যক্তি যদি পরমাত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, তবে তারই মধ্যে নিজেও বিরাজ করে।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে পিপ্পলাদ বলেন, 'ওম্' হলো সগুণ ও নির্গুণ দু-ই ব্রহ্মেরই প্রতীক। এই 'ওম্'-কে ঠিক ঠিকভাবে জানতে পারলে সাধক পরমশান্তি অনুভব করেন। জরা-ব্যাধি এবং সবরকম ভয় থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তখন অমৃতত্ত্ব লাভ করেন। পরমাত্মার সঙ্গেও এক হয়ে যান।

এক দিব্য বিভা তখন আচার্য পিপ্পলাদের আশ্রমের চারিপাশে। তিনি উত্তর দিয়ে বলেছেন আর তাতে কেবল প্রশ্নকর্তা নয়, অন্যদের হৃদয়ও হচ্ছে আলোকিত। পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হচ্ছেন তাঁরা। সেই পূর্ণতার এক চরমক্ষণে আচার্যকে প্রণাম করে বলেন ভরদ্বাজ-তনয় সুকেশা, শরবিদ্ধ পাখির মতোই হৃদয় আমার রক্তাক্ত। কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না হৃদয়ের সেই রক্তক্ষরণ।

স্মিতহাস্যে পিপ্পলাদ বলেন, কেন—কোন প্রশ্ন তোমাকে এমন ব্যাকুল করে তুলেছে?

ভগবান, কোসলের এক রাজপুত্র হিরণ্যাভ একদিন আমার কাছে এসে প্রশ্ন করেন, আপনি কি ষোলোকলা বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন? আমি বললাম, না এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। যদি জানতাম, তাহলে আপনাকে আমি অবশ্যই জানাতাম। আমার এই কথা শুনে তিনি নীরবে রথে চড়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে ওই প্রশ্নটি দিবারাত্র আমাকে বিদ্ধ করে বলেছে। কৃপা করে আমাকে বলুন, সে পুরুষ কোথায়?

শান্ত অথবা কিছুটা আত্মমগ্ন হয়েই বলেন আচার্য পিপ্পলাদ, হে সৌম্য, দেহের মধ্যেই রয়েছে পদ্মের মতো এক হৃদয়াকাশ। সেখানেই বিরাজ করছেন পরমাত্মা। সেই পরমাত্মার কাছ থেকেই এসেছে প্রাণ এবং তারই মতো ষোলোকলা বিশিষ্ট পুরুষ। সেই পুরুষ হলেন সগুণ ব্রহ্ম। তিনিই সৃষ্টি করেন প্রাণাত্মা হিরণ্যগর্ভকে। তার থেকেই উদ্ভব হলো শ্রদ্ধার। এই শ্রদ্ধা থেকেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ও ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। থামল না তাঁর সৃজন। এবার সৃষ্ট হলো মন ও অন্ন। অন্ন থেকেই ক্রমে উদ্ভব বীর্য, বেদসমূহ, কর্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি, স্বর্গ এবং বিভিন্ন লোকের। লোকসমূহ থেকে উৎক্রান্ত নানা নাম ও পদের।

পুরো ব্যাপারটি আরও বিশদ করার জন্যই আচার্য পিপ্পলাদ উদাহরণ দিলেন নদী ও সাগরের। বললেন, নদী বইতে থাকে সাগরের দিকে। একবার সাগরে মিশলে নদীর আর আলাদা কোনো অস্তিত্ব থাকে না । মুছে যায় নদীর নাম ইত্যাদি সব স্বরূপই। তখন তার একমাত্র পরিচয় সাগর। একইভাবে, কোনো মানুষ যখন নিজেকে জানে, তখন নিজেই 'পুরুষ' হয়ে যায়। তখন লোপ পায় ব্যক্তির সমস্ত উপাধি। ব্যক্তিই তখন রূপান্তরিত হয় 'পুরুষে'—সে পুরুষ নির্গুণ ও অমর। ব্যাপারটা সেই বাক্যবন্ধ—'নদী আসে মহাদেবের জটা থেকে আবার ফিরে যায় সেই মহাদেবেরই চরণতলে'-এর মতো।

পিপ্পলাদ বলেন, রথের চাকা দেখেছো। চাকার নাভি অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুতে যুক্ত থাকে রথবলের শলাকাগুলি। একইভাবে জীবাত্মার যেসব উপাধি তাও পুরুষের বা পরমাত্মার অবলম্বিত। তাই সেই পুরুষকে জানার চেষ্টা করতে হয়। তাকে জানতে পারলে মৃত্যু আর তাকে স্পর্শও করতে পারে না।

পিপ্পলাদ স্তব্ধ হলেন শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করে—'পরব্রহ্মকে আমি এই পর্যন্তই জানি। তাঁর মাঝে জানার আর কিছু নেই।

শিষ্যরা এবার পূর্ণকাম। অন্তর তাঁদের পরিপূর্ণ। তাই সশ্রদ্ধ চিত্তে আচার্য পিপ্পলাদকে প্রণাম করে বলেন, 'ত্বং হি নঃ পিতা'—আপনিই আমাদের পিতা। বাবা যেমন সন্তানদের দিয়ে যায় সব ধনসম্পদ, ঠিক সেভাবেই আপনি আমাদের দিলেন সর্বোচ্চ জ্ঞান। আপনিই আমাদের প্রকৃত পিতা— আপনিই দেখালেন আমাদের পরমের পথ।

প্রশ্ন উপনিষদে এভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে পরমতত্ত্বটি। এর মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের এক পরম বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এই ধর্মে গুরুকে পিতা বলা হয়। আচার্য শঙ্কর তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পিতা এই শরীর দিয়েছেন, তাই তিনি পূজনীয়। তাই জনকের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকে সন্তান। ভালোবাসে অন্তর দিয়ে। কিন্তু যিনি মুক্তির পথ দেখান—অভয়ধামে পৌঁছে দেন—তিনিও তো পিতা-ই। হিন্দুধর্মে গুরু তাই জীবনের কর্মবীর। তিনি পিতার পিতা—পরমপিতা। □

ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মাতৃসাধনা

সুতপা বসাক ভড়

'ঠাকুর'-এর প্রসঙ্গ মাত্রেই আমাদের সম্মুখে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র ভেসে ওঠে। যদিও 'ঠাকুর' বলতে মূলত আমরা যেকোনো দেব-দেবীকেই বুঝি। যেমন—দুর্গাঠাকুর, লক্ষ্মী ঠাকুর, সরস্বতী ঠাকুর, শিব ঠাকুর, কার্তিক ঠাকুর, গণেশ ঠাকুর ইত্যাদি। কিন্তু শুধুমাত্র ঠাকুর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বলরূপটিই ফুটে ওঠে। আবার এই 'রামকৃষ্ণ' নামের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের নাম বিদ্যমান। আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত বাক্য—যে রাম, সেই কৃষ্ণ, তিনিই আবার রামকৃষ্ণ। ইষ্টদেবতা রঘুবীর এবং দক্ষিণেশ্বরের রাধাকৃষ্ণ একাত্ম হয়েছেন ঠাকুরের মধ্যে। কোনো কাল্পনিক ঘটনা অথবা গল্পকথা বলে অবহেলা করতে পারব না, কারণ ১৮৩৬ থেকে ১৮৮৬ এই সময়ের মধ্যে লীলা করেছেন আমাদের পরমপ্রিয় ঠাকুর।

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মাতৃসাধনা আমাদের. শক্তিসাধনায় উদ্দীপ্ত করেছে। নারীপ্রতীকে এমন শুদ্ধভাবের সাধনা জগতে বিরল। জগন্মাতার ধ্যানে তন্ময় থেকে সকল নারীর মধ্যে ভবতারিণীর প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন তিনি। মাতৃউপাসক ঠাকুরের কাছে তাঁর জননী চন্দ্রমণি দেবী ছিলেন জগজ্জননী। অদ্বৈত সাধনার সময় তিনি তোতাপুরীর কাছে গোপনে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন কিন্তু মা কষ্ট পাবেন, সেজন্য মস্তক মুণ্ডন করেননি, গেরুয়া ধারণ করেননি। মায়ের কাছে বসে খেয়েছেন। আবার বিবাহিত হয়েও নিজ পত্নী শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যেও সেই আদিশক্তির অভিন্নতা উপলব্ধি করে মাতৃ সম্বোধন করেছেন এবং পুষ্পাদি দিয়ে তাঁর পূজা করেছেন। এমনকী বারবনিতাদের মধ্যেও জগন্মাতার দর্শন লাভ করে তাদের মাতৃসম্বোধনে সম্মানিত করে সমাধিস্থ হওয়ার মতো বহু ঘটনা আমরা তাঁর জীবনে দেখতে পাই। আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ছিলেন ঠাকুরের শিক্ষা ও অধ্যাত্ম সাধনার পথ প্রদর্শিকা।

ঠাকুরের পরিমণ্ডলে যেসকল উজ্জ্বল মাতৃশক্তির উপস্থিতি দেখতে পাই, তাঁদের মধ্যে রানি রাসমণি, গোপাল-মা, গৌরী-মা, গোপালের মা অঘোরমণি দেবী, লক্ষ্মী দিদি, মাতঙ্গিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দেবী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে ঠাকুরের যে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছিল, সেইদিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১৮৬১ সালের বসন্তকালের এক প্রত্যুষে গঙ্গাবক্ষে একটি ডিঙি চড়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে পদার্পণ করেন। ঠাকুর প্রত্যক্ষ করলেন একজন মধ্যবয়স্কা, গৈরিক বসনধারিণী, এলোকেশী সন্ন্যাসিনী হাতে একটি পুঁটলি নিয়ে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। তিনি ঠাকুরের শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিচিত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ঠাকুরকে নানান কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে দৃঢ় প্রত্যয় ও সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং ভগবানের অবতার এবং যুগ প্রয়োজনে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। সমসাময়িক পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ এবং পণ্ডিত গৌরীকান্ত তর্কালংকার ব্রাহ্মণীর মতকে সমর্থন করেন। ব্রাহ্মণীর পরিচালনায় অনেক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং আধ্যাত্মিক জগতের অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হন। পরবর্তীকালে উপদেশ মেনে বৃন্দাবনে যাত্রা করেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

ভারতীয় দর্শন আমাদের শেখায় যে স্ত্রীজাতি মাতৃসত্তারই প্রকাশ। এই দৃষ্টি নিয়েই নারীজাতিকে দেখতে হবে। আবার নারীদেরও এই আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সমগ্র জীবনচর্যা ও ব্যবহারে তার প্রকাশ ঘটানো বাঞ্ছনীয়। □

সন্দেশখালি প্রমাণ করল পশ্চিমবঙ্গে মধ্যযুগীয় বর্বরতাই চলছে

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

জানুয়ারি মাসের পর থেকেই সন্দেশখালির সন্দেশ রোজ আসছে। বর্বরতা, অসভ্যতা, গুন্ডামি, নির্লজ্জতার আর এক নাম হয়ে উঠল সন্দেশখালির স্থানীয় রাজনীতি। স্বস্তিকা পত্রিকায় জানুয়ারিতে নিবন্ধ লেখার সুযোগ হয়েছিল সন্দেশখালিতে ইনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট আধিকারিকদের হেনস্থা এবং তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী দ্বারা আধিকারিক নিগ্রহ নির্লজ্জতার। সেদিন থেকেই সর্বগুণসম্পন্ন তৃণমূলি সম্পদ, জঘন্যতার বাদশা শেখ শাজাহানের পাত্তা নেই। শেখ শাজাহানের পলাতক হওয়া; ধরে নিলাম এলাকা ছাড়া হয়ে কোনো এক শাসক রাজনীতিকের আঁচলের নীচে ঘাপটি মেরে রয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে হুড়মুড়িয়ে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেড়াচ্ছে। শেখ শাজাহান ও তার ডান ও বাম হাত যথাক্রমে শিবু ও উত্তম যারা শুধুমাত্রই ভেড়ি, পুকুর, জমি দখল, এলাকার গুন্ডামি, জোর জুলুম, কাটমানি, সিন্ডিকেট, তোলাবাজিতেই থেমে থাকেনি, তাদের রংবাজি চলেছিল নারী নির্যাতনে। এলাকার বাসিন্দাদের তারা অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করেছে। এবং সেই সব খেটে খাওয়া 'দিন আনি দিন খাই' মানুষের বাড়িতে চালিয়েছে নারী নিগ্রহ। জোর খাটানো, যৌন লালসা, ভোগ, মোচ্ছবে বেগার খাটার ডাক। দিনের পর দিন মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়েছে রাজনৈতিক একচ্ছত্র ক্ষমতার জোরে।

সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ আজ প্রতিবাদী। তারা ক্ষোভ উগরে চলেছে। শেখ শাজাহানের উত্থান কিন্তু বাম আমলেই। মাথার ওপর লাল ছাতা ছিল, তাই তরতরিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। গোরুপাচার, কাঠপাচার থেকে মাদক পাচার সব অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। পালাবদল হতেই তৃণমূলের সম্পদ

হয়ে উঠল শাজাহান। কারণ তার মতো দুর্বৃত্তকে কী আর যেমন তেমন ভাবে ফেলে রাখা যায়! তাই খাতায়-কলমে যে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ, সন্দেশখালি-১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সে আসলে এক দস্যু সম্রাট। তার দুই হাত শিবু আর উত্তমেরও একই গুণ একই বেগে রয়েছে। এই তিন মূর্তি একে অন্যের প্রতিলিপি বললে অত্যুক্তি হবে না। সন্দেশখালি-২ -এর ব্লক সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরা (শিবু) যে আবার তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্যও। উত্তম সরদার সন্দেশখালি-১-এর অঞ্চল সভাপতি এবং জেলা পরিষদ সদস্য । যদি উত্তমের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি, কোনোরূপেই শাজাহানের থেকে ভিন্ন নয়। প্রথমে ছাত্র পরিষদ, তারপর দল বদলে শাজাহানের ল্যাজ ধরে তৃণমূলের বিশ্বস্ত হওয়া। সন্ত্রাসে হাত শাণিত করা।

তাই ব্লকের দায়িত্ব থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলা পরিষদের টিকিট পেতেও সময় লাগল না। হাতে মাথা কাটার অভ্যাস তখন থেকেই। ব্লকের দায়িত্বে থাকাকালীনই জমির ওপর অবৈধ অনৈতিক দখলদারি শুরু করে। তার সন্ত্রাসী দক্ষতা রাজনৈতিক প্রমোশন আটকাতে পারল না। পরবর্তীতে জেলা পরিষদে এসেই কয়েক হাজার বিঘা কৃষি জমিতে লবণাক্ত জল ঢুকিয়ে দেয়। তা হয়ে গেল অত্যাচারে রূপান্তরিত ভেড়ি। মানুষ টাকা চাইলে জুটত মারধর, হুমকি। ইচ্ছে থাক বা না থাক, কাজ ফেলে তৃণমূলের সভা কর্মসূচিতে আসতেই হবে সবাইকে। এমন অসংখ্য অত্যাচার। যা লিখে-বলে-আলোচনা করে সম্পূর্ণ হয় না। বরং অত্যাচারের অসম্পূর্ণতা আরও প্রকট হয়। সে সব অত্যাচার নিরুত্তর ভাষাহীন বর্ণনাহীন ভাবে ক্ষোভের আকারে জমা হয় ওই সব ফ্যালফ্যাল মুখে অত্যাচার অবিচারের মুখে বাস করা মানুষগুলোর দেহ-মনে। তারা দিন কাটায়, কিন্তু মানুষের মতো বেঁচে থাকার ন্যূনতম মৌলিক অধিকারকে যারা চেনে না। চিনতে চাইলে যে শিবু উত্তমের হুকুমে প্রাণটাই থাকবে না।

সন্দেশখালির মানুষ যারা তৃণমূলের হিসেবে শুধুমাত্র ভোটার, তারা তো ভাবেইনি, একদিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আফিসাররা আসবে, অন্যায় অত্যাচারের দস্যুরাজ শাজাহান চম্পট দেবে। শিবু- উত্তমের দুষ্কৃতী গুরু নিখোঁজ, তারা অভিভাবকহীন। আজ অনেক গণমাধ্যম,

সামাজিক মাধ্যম, তাই অনেকটা ভরসা। অনেক মানুষ ফেটে পড়ছে ক্রোধে। নালিশ আর নালিশ। মানুষের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার চলেছে ওখানে যা নজিরবিহীন। অসামাজিক কাজকর্মের আঁতুড়ঘর ছিল সন্দেশখালি। এদের অত্যাচার কতটা তীব্র তা একটা উদাহরণ দিলে হয়তো আমরা একটু অনুধাবন করতে পারব। মনে আছে সন্দেশখালি-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝর্ণা হাজরার কথা? ওরই স্বামী শিবু হাজরা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ৪০০ বেনিফিশিয়ারির ৪ কোটি টাকা তছরুপ ধরে ফেলেন বিডিয়ো কৌশিক ভট্টাচার্য। শিবু হাজরার বাহিনী তারপর শারীরিক নিগ্রহ করেছিল কৌশিক ভট্টাচার্যকে। তাই অনুমেয় গ্রামের পরিবারগুলোকে কত নিগ্রহ প্রতিদিন মুখবুজে সহ্য করতে হয়। সন্দেশখালির মতো রাজনৈতিক লুণ্ঠন নয়, শেখ শাজাহানের বাহিনী অত্যাচারের দিনলিপিতে তালিকাভুক্ত করেছিল যৌন হেনস্থা ও নিগ্রহকেও। নারকীয় বর্বরোচিত সে কাহিনি।

আটপৌরে জীবনের বারান্দা থেকে বেরিয়ে বাড়ির বউরা যখন বলে— কার বাড়ির মেয়েটা সুন্দর তার বাড়তি কাজ বেশি রাতে স্থানীয় পার্টি অফিসে মনোরঞ্জন করতে যাওয়া— তখন মনে হয় এ তো মধ্যযুগীয় ইসলামিক বর্বরতার পুনরাবৃত্তি। রাজনৈতিক দাদার রংবাজি মানে কী? কতদূর আমরা জানতাম? রাজনৈতিক কবজা, দুর্নীতির চক্রব্যূহ, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি এবং প্রশাসনকে দলদাসে রূপান্তরিত করা। অভিযোগ করতে গেলেই থানার বড়োবাবু বলবে— পরে আয়, এখন যা। তারপর বলবে দাদার সঙ্গে কথা বলে মিটমাট করে নে। সন্দেশখালি থানার অভিযোগ খাতা খুলি— ক'টা অসহায় মানুষের অভিযোগ জমা রয়েছে। আমরা দেখতে চাই। ক'টা মানুষের তারপরেও সাহস হয়েছে বারবার অভিযোগ করতে যাওয়ার! তাই ক'টা যৌন হেনস্থা নিগ্রহ, নেতার মনোরঞ্জনে ক'জন মহিলার সম্ভ্রমহানি হয়েছে তার পরিসংখ্যান যদি কেউ চায়; তা হবে আরও বড়ো নির্লজ্জতা এবং সত্যির মুখোমুখি হতে ভয়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মোহে অনেক দিদি এখনও আচ্ছন্ন, তাই তারা অস্বীকার করছে এলাকায় কী মাত্রার মধ্যযুগীয় বর্বরতা হয়েছে। সেই সব বিচ্ছিন্ন ছবি, ভিডিয়োয় পরিষ্কার ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং তা যে শেখ শাজাহানের অনুপ্রেরণার ফল তা বুঝতে এক নিমেষ লাগে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলেই পাহাড়সম দুর্নীতি সন্ত্রাসের খবর এসেছে।

কিন্তু পাহাড়সম নারীসম্ভ্রম লুণ্ঠনের খবর আসেনি। তাই সন্দেশখালির নারীনিগ্রহের এই আওয়াজ অনুরণন করে বলছে— পশ্চিমবঙ্গে যৌননির্যাতনটাও বুখ ফুলিয়ে হয়। যৌননির্যাতন ও দুর্নীতি যে একই মুদ্রার দুই পিঠ তা প্রতিষ্ঠিত করছে সন্দেশখালি। এতদিন শুনেছি যেখানে বর্বর যুদ্ধ চলে, যেখানে জমি দখল করে ক্ষুধার্ত পাশবিক সৈন্য তা সে টিউনিশিয়া হোক কিংবা ইউক্রেন। সেখানে নারীকে লাঞ্ছিত হতে হয়। কিন্তু একটা নির্বাচিত সরকার, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং ভদ্র সমাজেও যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কবজির জোরজুলুমে স্ত্রী মর্যাদা নিয়ে প্রহসন করা যায়, পণ্যের মতো ব্যবহার করা যায় নারীদের, মূলত বস্তুর মতো তার ডাক আসে— তখন নিজেকে সেই সমাজের, সেই রাজ্যের অংশ ভাবতে ধিক্কার লাগে।

২০১২-র পর ল্যাটিন আমেরিকার কিছু কিছু দেশ Sextortion শব্দে উত্তাল হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টার‍্যাশাল সার্ভে করে তাজ্জব! চিলি, পানামা, বার্বাডোস, বাহামা, মেক্সিকোতে উল্লেখযোগ্য ভাবে যৌন অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক দুর্বৃত্তায়নের তথ্য উঠে আসে। তারাও কিন্তু থানাতে ডায়েরির প্রমাণ দিতে পারেনি। যখন জনরোষে, কলরবে, প্রতিবাদে, উত্তেজনায় একজন-দু'জন-তিনজন মহিলার জন্য নয়, জাতির জন্য সম্ভ্রম রক্ষার ধ্বনি উচ্চারিত হয় তখন তার কিছুতো প্রেক্ষাপট আছেই আছে। তাই যে সত্যতা অভিযোগের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করে আন্তর্জাতিক ময়দানে আনল আন্তর্জাতিক তথ্য গবেষণা সংস্থা (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল/রয়টার্স) তা যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রশাসন এবং অতি অবশ্যই তৃণমূল 'সাজানো ঘটনা' বলে উড়িয়ে দেয় বা যথাযথ গুরুত্ব না দেয় তবে বলব এ রাজ্যে কেনিয়ার ব্যবস্থাই আসন্ন। যেখানে ধরা পড়েছিল, স্বাদু জল পেতেও এক একটি পরিবারের মহিলাদের সম্ভ্রমহানি হয় প্রশাসনিক কর্তাদের হাতে। তবে কি পশ্চিমবঙ্গটা মেক্সিকোর পথে হাঁটছে? অথবা কেনিয়া! ওসবতো মাফিয়া, ড্রাগ, সন্ত্রাস আর অসভ্যতার জন্য কুখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ, বাঙ্গালি, কালচাল, আর্ট, সর্বোপরি কোথায় গেল তবে এত উন্নয়ন!

বাম আমলের সুটিয়া গ্রামের কথা আবার মন করালো সন্দেশখালি। যে সুটিয়া গ্রাম ছিল ধর্ষণ গ্রাম। সন্দেশখালি ধর্ষণ অঞ্চল ঠিক বলব না, উন্নয়নের জোয়ার, শেখ শাজাহানের কৃতিত্বে তা হেনস্থা— মহিলা হয়রানির পাকা ঠিকানাতো বটেই। দুর্ভাগ্য এই যে, অন্যায়েরও বিচার বিভাগ করতে হচ্ছে; সুটিয়া কেমন ছিল আর সন্দেশখালি কেমন। উষ্ণীষ-পরা মস্তক তুলে অন্যায়ের প্রতিবাদ এখনও কিন্তু দলমত নির্বিশেষে সবাই করছে না। অনুপ্রেরণার কৃপানির্ঝরে যে একাংশের মানুষ এখনও জোড় হস্তে রয়েছে। পাতায়-পাতায় শিকড়ে-শিকড়ে রাজনৈতিক পচন পৌঁছাচ্ছে। ঘটেছে প্রশাসনিক পঙ্গুতা।

রাজনৈতিক কোন্দল, দুর্নীতি এইসব চর্চা করতে করতে একদিন যে পাতাজুড়ে এক আস্ত অঞ্চলের নারী নির্যাতনের হয়রানির বিশ্রী রূপ সহ্য করে সে প্রসঙ্গে হৃদয়বিদারক ছবি ধরতে হবে, এর চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি আর কিছুই হয় না। সন্দেশখালি ছিঁচকাদুনে নয়, প্রতিবাদের পথ দেখাল সন্দেশখালি। চাষ করা, বড়ি দেওয়া, আচার করা, শাঁখা-সিঁদুর পরিহিতা মা-কাকিমারা যে ভাবে প্রতিবাদ করছে— তাতে স্পষ্ট যে সংস্কার ছাড়া পথ নেই।

বিষয়টা শেখ শাজাহান কিংবা শিবুতে থেমে গেলে তা অসম্পূর্ণ হবে। সন্দেশখালি ইঙ্গিত দিল— এ রোগ আরও অনেক খানে তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক ঘটকালি না করে এবার যে প্রশাসনিক তৎপরতাই একমাত্র পথ সে বার্তাও দিল সন্দেশখালি। সন্দেশখালি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ঝুলি থেকে বিড়াল বেরানোটা আকস্মিক বড়ো জোর। রাজ্যটা মরচে ধরা লোহা, অচল। সন্দেশখালি একটা আগুন। হয়তো কিছুটা লোহার মরচে সরাবে সন্দেশখালি। □

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক মহাপুরুষের মূল্যায়ন

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

সন্দীপ কুমার সিনহা লিখিত ‘ইতিহাসের আলোকে স্বামী প্রণবানন্দ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ’ পুস্তকটি পড়ে বিশেষ আনন্দ অনুভব করলাম। স্বামী প্রণবানন্দ এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সম্পর্কে প্রায় সকলেই জানেন। সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। সর্বজন গ্রাহ্য— কিন্তু তবুও আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিত এই পুস্তক লেখার যে আগ্রহ লেখক দেখিয়েছেন তা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। স্বামী প্রণবানন্দের জন্ম হয়েছিল ১৩০ বছর আগে এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ আজ শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে। এই সময়ের মধ্যে সঙ্ঘের ভাবধারায় ভাবিত বহু মানুষ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, পূর্ববঙ্গ-সহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে অনেক মঠ তৈরি হয়েছে। কারও মনে হতে পারে এই পুস্তকের গুরুত্ব কম। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই— এই পুস্তকের গ্রহণযোগ্যতা একটু অন্য ধরনের। লেখক কেবল মাত্র প্রণবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত ও কর্ম নিয়ে আলোকপাত করেননি বরং প্রতিক্ষেত্রে সমকালীন প্রেক্ষাপট, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। স্বামী প্রণবানন্দ শুধুমাত্র ধ্যান জপ নিয়ে ব্যস্ত থাকেননি, বরং প্রতিমুহূর্তে বালক ও কিশোরদের গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে নজর দিতে বলতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন সেবা কাজের মধ্যদিয়ে সামজের কল্যাণ করতে।

স্বামী প্রণবানন্দের বাল্যনাম ছিল বিনোদ। তাঁর মর্ত্যজীবন দীর্ঘ ছিল না, মাত্র ৪৬ বছর। লেখক তার জীবনের বিভিন্ন অংশকে বয়স ও কর্মের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করার জন্য আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রতিক্ষেত্রে বিনোদের বয়সের তুলনায় কর্মের পরিপক্কতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে বিনোদ থেকে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ হয়ে ওঠার বাস্তব

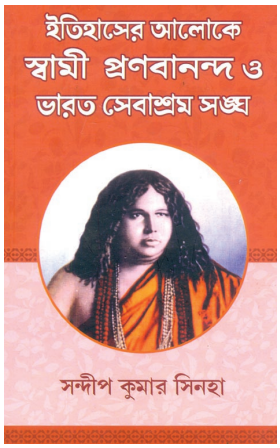

চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, বর্তমান যুগেও সাধারণ মানুষের ধারণা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই প্রসঙ্গটি লেখক শ্রী সিনহা খুবই প্রাসঙ্গিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সকলের গ্রহণ করার মতো বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর জন্মের আগেই দেশব্যাপী এমনকী বিদেশেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন যথেষ্ট পরিচিত। সেই অবসরে শ্রীরামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও ভারত সেবাশ্রমের মতো আরেকটি সেবামূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা তৈরি করার প্রয়োজন কেন বোধ করেছিলেন— সেই যুক্তিও লেখক খাড়া করেছেন। এই বিষয়টি বর্তমানে বিশেষ করে নবীনদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধাণযোগ্য। বর্তমান যুগে যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অনুগামী বা সমর্থক তাঁরা কথাবার্তায় সম্পূর্ণ অন্য ধারার কথা বলে থাকেন। লেখক শুধুমাত্র নিজস্ব যুক্তি দেখাননি বরং বহু তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন। এজন্য প্রায় আড়াইশো জনেরও বেশি বিশিষ্ট লেখক, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের লিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকের তালিকা দিয়েছেন। প্রতিক্ষেত্রে তথ্যসূত্র সংবলিত করে লেখাকে পুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। যার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে বালক বিনোদ থেকে আচার্য প্রণবানন্দ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধাপে তিনি কীভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছেন, কীভাবে নিজেকে হিন্দু ধারার মধ্যে রেখেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। আমাদের স্মরণ করে দিয়েছেন, বিভিন্ন নদীর উৎস ও গতিপথ আলাদা হয়েও সবগুলি সাগরে এসে মিলিত হয়। বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে যে কোনো ধারাই যদি দেশহিতক, সমাজহিতক তথা মানব কল্যাণকারী হয়, তাহলেই তার মধ্যে বিরোধ না খুঁজে গ্রহণ করার চেষ্টাই বেশি প্রয়োজনীয়। সেই দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের জীবনকালকে সামনে রেখে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তাঁর যে মূল্যায়ন করেছেন তাতে পুস্তকের নামকরণ সার্থক হয়েছে বলে মনে করি। লেখক একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পরিবার ও সংসারের নানান দায়িত্ব পালন করেও এই ধরনের পুস্তক লিখেছেন, তারজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

পুস্তকের ভাষা খুবই প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। কিছু বানান ভুল থাকলেও সামগ্রিকভাবে প্রচ্ছদ ও আকার দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। উপস্থাপনা একঘেয়েমি না হওয়ার কারণে যাঁরা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজকে বা তাঁর প্রতিষ্ঠানকে জানেন না, তাঁদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস। পুস্তকটি মানুষের কাছে অধিকমাত্রায় গ্রহণযোগ্য হোক, এই কামনা করি।

পুস্তকের নাম ঃ ইতিহাসের আলোকে স্বামী প্রণবানন্দ ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ।
লেখক ঃ শ্রীসন্দীপ কুমার সিনহা।
প্রকাশক ঃ তুহিনা প্রকাশনী। **মূল্য ঃ** ৩০০.০০ টাকা।

ব্যাঙ্গালুরুতে সংস্কার ভারতীর সমরসতা শোভাযাত্রা

ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিম, একই সুর একই গাথা। কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিছে জয়তু ভারতমাতা।-- গত ১ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্গালুরুর আর্ট অব লিভিং-এর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় কলা সাধক সঙ্গম-২০২৪।

কলা সাধক সঙ্গমের শেষ দিন অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ছিল শোভাযাত্রা। কাশ্মীর থেকে কেরালা, গুজরাট থেকে পূর্বাঞ্চলের আটটি প্রদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ যোগদানে সমগ্র ভারতের একটা খণ্ডচিত্র এদিন ব্যাঙ্গালুরুর আর্ট অব লিভিং পরিসরে উদ্ভাসিত হলো। নানা ভাষা, নানা পরিধানে সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মধ্যে একটিই সুর বাঁধা ছিল— জয়তু ভারতমাতা।

শোভাযাত্রার শুভারম্ভ হয় আর্ট অব লিভিঙের ছোট্টো টিলার ওপর অবস্থিত ধ্যানমন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণ থেকে শ্রীগণেশ বন্দনার মাধ্যমে। বন্দনায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা ছিল বিশেষভাবে সক্ষম বালক-বালিকারা। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে বৃহদাকার শিঙ্গা ও ডুগডুগি বাজিয়ে পরম্পরাগত পোশাকে শিল্পীরা নৃত্যের তালে তালে শোভাযাত্রার সূচনা করলেন। পেছনেই পরম্পরাগত পোশাকে অরুণাচল-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্পীরা তাঁদের নিজ ভাষায় গানের সুরে ড্রাম বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। তারপরেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের চিত্র নিয়ে কপালে তিলক, গলায় নামাবলী বা উত্তরীয় , লালাপেড়ে সাদা শাড়ি ও সাদা ব্লাউজে মা-বোনেরা এবং শুভ্রবেশে পুরুশেরা কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরা।

পেছনেই পালকি-সহ শ্রীজগন্নাথ-বলরাম- সুভদ্রার মূর্তি নিয়ে উৎকলের শিল্পীরা তাঁদের পরম্পরাগত পোশাকে বাজনার তালে তালে, কীর্তন করতে করতে চলেছেন। তাঁদের পেছনে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা। তাঁদের পেছনে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গির সাজে নৃত্য করতে করতে চলেছেন ছত্তিশগড়ের শিল্পীরা। তারপরে মহাকোশল প্রান্তের শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্র-সহ শিবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলেছেন।

তারপরে মালোয়া প্রান্তের শিল্পীরা মহাকালেশ্বর শিবের মূর্তি-সহ এগিয়ে চলেছেন। তাদের অগ্রভাগে মেয়েরা লাঠিখেলা ও বিভিন্ন প্রকার জাগলিং-এর প্রদর্শন করে চলেছেন। তারপর গুজরাটের শিল্পীরা মাথায় পাগড়ি-সহ বিশাল ছত্র নিয়ে। তারপরে গোয়ার শিল্পীরা বিভিন্ন রঙের পাতাকা নিয়ে চলেছেন। এভাবে একের পর রাজ্যের শিল্পীরা চলেছেন। □

সমুদ্রপারেও সুগন্ধির সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অ্যারোম্যাটিক অ্যান্ড অ্যালায়েড কেমিক্যালস্ হলো সুগন্ধি দ্রব্য বা আতর প্রস্তুতি ও রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত উত্তরপ্রদেশের একটি কোম্পানি। ২০১৩ সালে এই কোম্পানিটির সর্বময় কর্তা গৌরব মিত্তল মাত্র ৫০ হাজার টাকা পুঁজি করে কোম্পানিটির সূত্রপাত করেন। আজ কোম্পানিটির বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ ১০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। বিশ্ব জুড়ে কোম্পানিটির উৎপাদিত প্রাকৃতিক আতর, সুগন্ধি তেল, পকেট পারফিউম, শ্যাম্পু, বডি লোশন, ডং পারফিউম ইত্যাদি পণ্যের চাহিদা রয়েছে। বরেলী ও দেরাদুনে আছে কোম্পানিটির দুটি শোরুম। বিদেশেও শোরুম স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন গৌরব।

গৌরবের বাবা ব্রিজেশ মিত্তল একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। ইঞ্জিনিয়র হলেও কৃষিকাজে ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। এই কারণে ১৯৭৭ সালে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পিলিভিত অঞ্চলে বীসলপুর নামের একটি ছোট্টো গ্রামে পিপারমিন্ট, লেমন গ্রাস, জামরোজার মতো ঘাসজাতীয় সুগন্ধি উদ্ভিদের চাষ শুরু করেন। এইভাবে বরেলী ও কাছাকাছি এলাকার কৃষকদের সঙ্গে ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর ৩৫ বছর ধরে অভিজ্ঞতা ও পুঁজি সঞ্চয় করে বরেলীর সীবীগঞ্জে তিনি অ্যারোম্যাটিক অ্যানালাইজ কেমিক্যালস্ ফ্যাক্টরি নামে একটি কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু ব্যবসায়িক অংশীদারদের দ্বারা প্রতারণার শিকার হলেন। এতে মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং ২০১২ সালে পরলোকগমন করেন। গৌরব তখন ফ্রান্সে কর্মরত। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের কাছে পুঁজি হিসেবে ছিল মাত্র ৫০ হাজার টাকা। বাবার অংশীদাররা তাঁর পুরো ব্যবসাটিই তাদের হস্তগত করে নিয়েছিল এবং কারখানায় পড়ে থাকা যন্ত্রপাতি ও উৎপাদিত পণ্য কর্মচারীরা নিয়ে যান।

সুগন্ধি দ্রব্যপণ্যের ব্যবসায়ী হয়ে ওঠা ছিল গৌরবের স্বপ্ন। এই কারণে সেই চিন্তাভাবনা অনুযায়ী পড়াশোনাও করেছিলেন। সৈনিক স্কুল থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর কানপুর আইআইটি থেকে বি.টেক ও ফুড ইঞ্জিনিয়ারিঙে মাস্টার (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর প্যারিস ও লন্ডন হতে এমবিএ করে ব্রিটেন, আমেরিকা, দুবাই ও ফ্রান্সে চাকরি করেন। বাবার মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে বরেলীতে নিজস্ব ব্যবসার সূচনা করেন। তাঁর বাবার মতো তিনিও লাভ করেন কৃষকদের সহযোগিতা। গোড়াতেই অংশীদারদের তরফে প্রতারণার প্রবণতা সামনে আসতেই এবার একাই অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এবার একটি নতুন কোম্পানি তৈরি করলেন। বিভিন্ন দেশে থাকার কারণে বিদেশি বাজার সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা থাকার দরুন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলিতে তিনি অংশগ্রহণ করতে থাকেন। এইভাবে তিনি সুগন্ধি পণ্য সামগ্রীর ছোটো খাটো অর্ডার পেতে থাকলেন। তাঁর কঠিন পরিশ্রম কাজে আসে এবং তাঁর কোম্পানি ভারতের বাইরে নিজের একটি পরিচয় সৃষ্টিতে সক্ষম হলো।

করোনা মহামারীর সময় দেশ ও পৃথিবী জুড়ে জীবনযাত্রা যখন স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই সময় হরিয়ানার বল্লভগড়ে সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যে তিনি একটি নতুন কারখানা স্থাপন করলেন। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরে একাধিক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন, অগণিত সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশের মাটিতেও তাঁর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড আজ বিস্তৃত।

সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গেও গৌরব যুক্ত রয়েছেন। বরেলীতে চারটি গ্রামকে দত্তক নিয়ে সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানা রকমের উন্নয়নমূলক কাজে যথাসম্ভব সাহায্য তিনি করে চলেছেন। সাফল্যের এই সিঁড়িতে আরোহণের ফলে অনেকেই হয়ে উঠেছেন তাঁর শত্রু। দু'বার তাঁর ওপরে প্রাণঘাতী আক্রমণও হয়েছে। একবার পায়ে বুলেটের আঘাত পান। আরেক বার সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা হয়।

মৃত্যুভয়হীন, উদ্যমী, শিল্প স্থাপনে উৎসাহী যুবক গৌরব মিত্তলের সাফল্য লাভের এই আখ্যান ভারতের যুব সম্প্রদায়ের কাছে অবশ্যই প্রেরণা ও উদ্দীপনাদায়ী। □

শ্রেষ্ঠ দাতা

মহারাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার এক জঙ্গলে খরগোশ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই জঙ্গলে বাস করত একটি ভোঁদড়, একটি বাঁদর আর একটি শেয়াল।

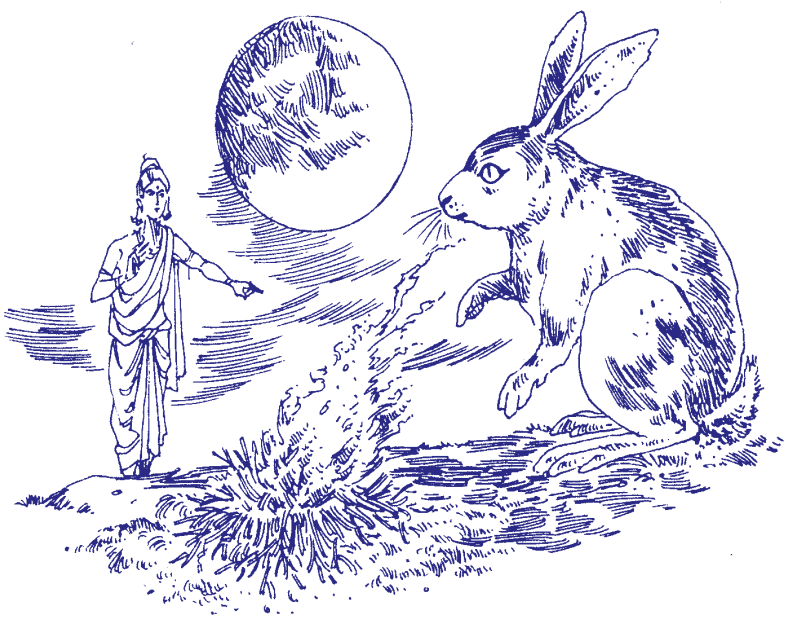

তাদের চারজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিন বন্ধুই খরগোশের কথা মেনে চলত, কারণ খরগোশ ছিল খুব বুদ্ধিমান আর অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির। সে সকলকে ধর্মকথা শোনাত, ভালো কাজ করতে বলত। খরগোশের তিনবন্ধু খুব মন দিয়ে সেইসব কথা শুনত।

খরগোশ একদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল যে আগামীকাল পূর্ণিমা। সে তার তিন বন্ধুকে ডেকে বলল, শোনো ভাই, আগামীকাল পূর্ণিমা। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে উপবাস করে দানধ্যান করলে মহা পুণ্য অর্জন করা যায়। আমরা সবাই উপবাস করে দানধ্যান করবো। সবাই রাজি হয়ে গেল।

পরের দিন ভোরবেলা ভোঁদড় গেল নদীর ধারে। সেখানে সে দেখল এক জেলে সাতটি ধরে এনে মাছ বালি চাপা দিয়ে আবার নদীতে আবার গেল মাছ ধরতে। ভোঁদড় ওই সাতটি মাছ নিয়ে খুব নীচু স্বরে বলে উঠল, মাছগুলি কে রেখেছে? কোনো উত্তর না পেয়ে মাছগুলি নিয়ে এসে নিজের গর্তে রেখে দিল।

শেয়াল ঠিক একইভাবে এক হাঁড়ি দই জোগাড় করল। বাঁদরও অন্যের বাগান থেকে পাকা আম পেড়ে আনলো। এভাবে তিন বন্ধুই পুণ্য অর্জনের কথা চিন্তা করতে লাগল।

খরগোশ ভাবল সে তো তৃণভোজী। আর তৃণ তো ব্রাহ্মণের খাবার নয়। কোনো প্রাণী হত্যা করে ব্রাহ্মণকে খেতে দিলে তো মহাপাপ হবে। মনে মনে সে ঠিক করল নিজেকেই খাদ্য হিসেবে ব্রাহ্মণের কাছে তুলে ধরবে।

দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বরূপী খরগোশের মনের কথা জানতে পেরে স্থির করলেন যে খরগোশ দাতা হিসেবে কত মহান তা পরীক্ষা করে দেখবেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেবরাজ ইন্দ্র সেই বনে এলেন। তিনি ভোঁদড়, বাঁদর ও শেয়ালের কুটিরে গেলেন। প্রত্যেকেই তাদের সংগৃহীত খাবার গ্রহণ করার জন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করল। দেবরাজ কোনো খাবার গ্রহণ না করে বললেন, পরে কোনোদিন এসে প্রত্যেকের দেওয়া খাবার গ্রহণ করবেন।

এরপর দেবরাজ এসে উপস্থিত হলেন খরগোশের জীর্ণ কুটিরের সামনে। চিৎকার করে বললেন, ভিক্ষে দাও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে। খরগোশ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে বললেন, আপনি আগুন জ্বালান, আমি প্রস্তুত করছি আপনার আহার্য।

ব্রাহ্মণ বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, আগুন জ্বালিয়ে তুমি আমায় কী খাদ্য দেবে? খরগোশ বলল, আমি আগুনে ঝাঁপ দেব। আমার শরীর পুড়ে ঝলসে গেলে আপনার আহার্য তৈরি হবে। দেবরাজ আগুন জ্বালালেন। খরগোশ অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলল, হে ব্রাহ্মণ আপনি ভালোভাবে দেখুন, আমার শরীরে আর কোনো প্রাণী আছে কিনা। তা হলে আমি প্রাণীহত্যার ভাগী হবো।

ব্রাহ্মণ খরগোশকে খুব ভালোভাবে দেখে বললেন, ঠিক আছে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে খরগোশ আগুনে ঝাঁপ দিল। আগুনে শরীর ঝলসে যাওয়ার বদলে খরগোশ অনুভব করলে তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। অবাক হয়ে খরগোশ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করল, হে ব্রাহ্মণ, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া সত্ত্বেও আমার শরীর ঠাণ্ডা কেন?

ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্র বললেন, তোমার মতো শ্রেষ্ঠ দাতার পক্ষেই এরূপ সম্ভব। অপরের খাদ্যের জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠা নেই তোমার। তুমি সত্যিই শ্রেষ্ঠ দাতা।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র খরগোশকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

সংগৃহীত

নদ-নদী পরিচয়

তিস্তা

তিস্তানদীর উৎসস্থল সিকিমের হিমালয় পর্বতমালার ১৭ হাজার ৪৮৭ ফুট উচ্চতায় সো লামো হ্রদ থেকে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় একে ত্রিস্রোতা নাম অভিহিত করা হয়েছে। শিলিগুড়ি শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে সেবকের করোনেশন সেতু পেরিয়ে তিস্তানদী পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে। তারপর জলপাইগুড়ি জেলা এবং বাংলাদেশের রংপুর জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে মিশেছে। এই নদীকে সিকিম ও উত্তরবঙ্গের জীবনরেখা বলা হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১৩

मम नाम प्रिया, अहं छात्रा।
আমার নাম প্রিয়া, আমি ছাত্রী।

উপস্থাপন—

भवती का ? তুমি/আপনি কে?
अहं बालिका। আমি বালিকা।
भवती का ?- अहं शिक्षिका।
भवती का ?- अहं **भगिनी**
भवती का ?- अहं वैद्या।
भवती- ?- अहं गृहिणी।
- का ?- अहं राधा।
- - ? - काकलि:।

অভ্যাস করি—

सोमा, नवनीता, प्रतिमा, वैशा ,वैशाली, विदिशा, जया, भार्गवी, भवानी, रुद्राणी, सुचेतना, नारी, नायिका , सञ्चालिका।

প্রয়োগ—

भवती का ? – **এটি দিয়ে পরিচিত মেয়েদের জিজ্ঞাসা করতে হবে।**

ভালো কথা

আয়না

আমাদের বাড়ির বারান্দায় একটি ড্রেসিং টেবিল রাখা আছে। বহু পুরোনো। কিন্তু এখনো চকচক করছে। দিনে একবার শুধু মা চুল আঁচড়ায়। আমি দুবার। কিন্তু আয়নাটিতে আরও কয়েকজনের খেলা চলে। সকালেই পাশের বাড়ির মেনি বেড়ালটা এসে আয়নার সামনে নিজের ছবির সঙ্গে তিন-চার মিনিট ঝগড়া করে চলে যায়। আর তারপরেই কয়েকটা চড়াই এসে খুব ঝগড়া আর হুটোপুটি করে চলে যায়। মেনিটা একবারই আসে। কিন্তু চড়াইগুলি বেশ কয়েকবার আসে। ঠাকুমা বলে, আমার বাবাও শিশুকালে আয়নাটির সামনে নিজের ছবির সঙ্গে খেলা করত।

মৌসুমি মাহাত, সপ্তম শ্রেণী, রানিবাঁধ, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ন দ পা উ
(২) ত্র প র উ

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) হি অ সা ন ধ ত
(২) সু কু কা আ শ ম

১৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) চিরবসন্ত (২) চিরসবুজ

১৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) চিন্তাভারাক্রান্ত (২) চিলচিৎকার

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, ইংলিশ বাজার, মালদা। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মণ্ডহারবার, দঃ ২৪ পঃ। (৩) অনামিকা পাল, শিলচর, অসম (৪) শ্রেয়া মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

With Best Compliments from -

A
Well wisher

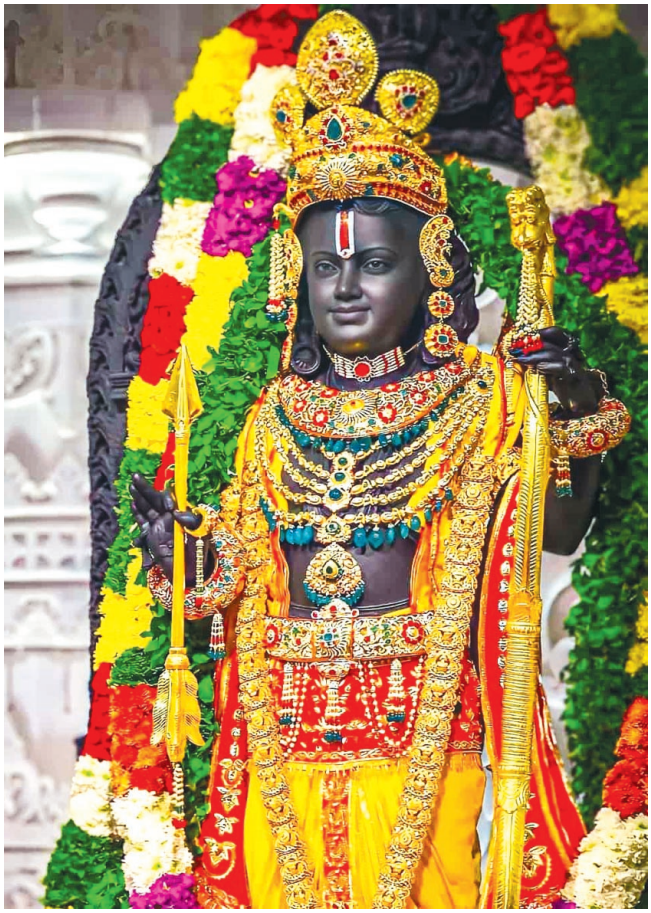

রামলালার শ্যামল অঙ্গে অরুণোজ্জ্বল রত্নালংকার

দুর্গাপদ ঘোষ

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজের সৃষ্টি দেখে যখন বিস্মিত, বিমোহিত হন, আদ্যোপান্ত অবলোকন করে যখন নিজেই চিনতে পারেন না, অভিভূত হয়ে আত্মগত স্বরে বলেন, 'আমি এ কী দেখছি! এ তো আমার সৃষ্টি নয়! এ তো দেখছি ঈশ্বর নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন', তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁর সৃষ্টি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, অসামান্য হয়েছে, প্রাণবন্ত হয়েছে। কর্ণাটকের মহীশূরের ভাস্কর অরুণ যোগীরাজ অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠিত ও রত্নালংকারে সজ্জিত রামলালার বিগ্রহের দিকে অনেকক্ষণ ধরে অপলকে তাকিয়ে থাকার পর তাঁর অপরূপ সৃষ্টি সম্পর্কে এভাবেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন গত ২২ জানুয়ারি। ৬ X ৪ X ৩.৫ ফুট একখণ্ড শালগ্রাম শিলায় (গ্রানাইট স্টোন) বিষ্ণুর দশাবতারের কারুকার্যময় পশ্চাৎপটের মধ্যমণি পাঁচবছর বয়সি রামলালার বিগ্রহ দেখে তার সৃষ্টিকর্তা এভাবে সম্মোহিত হবেনই না কেন! মূর্তি তো নয়, যেন শিশুসুলভ প্রাণচঞ্চল দশরথ নন্দন মৃদুমন্দ স্মিতহাসিতে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আপাদমস্তক হীরক-মানিক খচিত স্বর্ণালংকারে সজ্জিত রামায়ণের সেই রাজপুত্র। যাঁর সম্পর্কে ওই ঐতিহাসিক মহাকাব্য রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি লিখে গেছে—'ধৈর্যেন হিমাদ্রেশ্চৈব সমুদ্র এব গাম্ভীর্যে....।' রামজন্মভূমি মন্দিরে বিরাজমান রামলালার এই মূর্তিতে পরিণত বয়সি শ্রীরামচন্দ্রের সেই পুরুষাকারের সম্পূর্ণতা হয়তো নেই কিন্তু চঞ্চল শিশুসুলভ ভঙ্গিমার মধ্যেও পদ্মের পাপড়ির মতো ভাস্বর চোখদুটি যেন সর্বজ্ঞতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বোধহয় না বললেই নয়। তা হলো, ভাস্কর যোগীরাজ এই চোখদুটি খোদাই করেছেন সোনার ছেনি ও রুপোর হাতুড়ি দিয়ে। বিগ্রহের স্মিত হাসি যেমন অনেক রহস্যের সংকেত দিচ্ছে তেমনি মন্ত্রমুগ্ধ করছে সমগ্র জগৎবাসীকে। প্রত্যক্ষদর্শী সকলেরই এক কথা—টিভি'র পর্দা কিম্বা ছবি দেখে যতখানি প্রাণবন্ত মনে হয় সামনাসামনি তার চাইতে অনেক বেশিগুণ প্রাণময়। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। এক নিমেষে প্রাণ-মন কেড়ে নেয় উজ্জ্বল রত্নালংকার মোড়া এই রাজপুত্র। মাথার মুকুট থেকে পায়ের নূপুর পর্যন্ত কী অসাধারণ কারুকার্য খচিত। পাপড়ি মেলা পদ্মফুলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের মূর্তি তো নয়, যেন 'ঠমক চলত রামচন্দ্র...'।

শুধু কি নূপুর! কী নেই তাঁর অঙ্গালংকারে। নয় নয় করেও ১৪ রকমের অরুণোজ্জ্বল গহনায় সজ্জিত হয়ে সর্বসমক্ষে বিরাজমান। 'হল মার্ক' প্রাপ্ত খাঁটি সোনার উপরে হিরা-চুনি-পান্না যে সমস্ত বত্ন খচিত হয়েছে সেসব কেবল সর্বোচ্চমানের ও দুর্মূল্যই নয়, রীতিমতো 'ইন্টারন্যাশনাল জেমোলজিক্যাল ইনসটিটিউট' (আই. জি. আই)-এর শংসাপত্র প্রাপ্তও। সেই সঙ্গে ক্ষেত্র বিশেষে প্রকৃতি-পরিবেশ এবং প্রাচীন ভারতের অমূল্য সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। রামলালার যাবতীয় রত্নালংকার নির্মাতারা জানিয়েছেন যে তাঁরা রামায়ণ এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা ও বিবরণ লাভ করে এইসব অলংকারাদি তৈরি করেছেন। বিগ্রহের ডান হাতের বাণ (তির) এবং বাঁ হাতের ধনুষ (ধনুক)-ও তৈরি হয়েছে খাঁটি সোনা দিয়ে। মাথায় মুকুট, কপালে তিলক, গলায় চিক, কাঁধ থেকে প্রায়

পদপ্রান্ত পর্যন্ত স্তরে স্তরে চন্দ্রহার, পাঁচনরি হার, প্রায় ৪ ফুট লম্বা 'বিজয় মালা', দুই বাহুতে বাজুবন্ধ (আর্মলেট), কবজিবন্ধ (রিস্টলেট), একজোড়া কঙ্কন, দু' হাতের দুই অনামিকায় আংটি, কোমরবন্ধ (ওয়েস্ট বেল্ট), দু' পায়ের গোড়ালিতে গোলাকার পাগকড়া (অ্যাঙ্কলেট), দু' পায়ের পাতায় নকশাখচিত পায়েল বা নূপুর। এই সমস্ত স্বর্ণালংকারে খচিত হয়েছে নানা মাপের মোট ৪৩৯টি হিরা, ৬১৫টি পান্না এবং ২ হাজার ৯৮৪টি চুনি। এছাড়াও রয়েছে মোট ১৮ হাজার ৫৬৭ খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও গোলাকার হিরের টুকরো। সবচাইতে দৃষ্টিনন্দন অবশ্যই মাথার মুকুট। এটি দুই অংশে বিভক্ত। সামনের অংশ নির্মিত হয়েছে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম বা ২৪ ক্যারেটের খাঁটি সোনা দিয়ে। আর পিছনের অংশ তৈরি হয়েছে ২২ ক্যারেটের সোনায়। তার ওজন ৫০০ গ্রাম। দুই অংশ মিলে মুকুটটিতে রয়েছে ২ কেজি ২০০ গ্রাম সোনা। মুকুটের দুই অংশ খিলান দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা আছে। দরকার মতো যাতে খোলা এবং পরানো যায়। দর্শনার্থীদের নজর আটকে যাওয়া এই অনন্যসুন্দর রাজমুকুটের মাঝখানে খচিত হয়েছে অন্যান্য মণিরত্ন-সহ ২৬২ ক্যারেট চুনি এবং ১৩৫ ক্যারেট জাম্বিয়ান পান্না দিয়ে ঘেরা ৭৫ ক্যারেটের দ্যুতি বিচ্ছুরণকারী একখণ্ড হিরা। এটি হলো শ্রীরামচন্দ্রের সূর্যবংশের প্রতীক। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী হিরা হলো সততা ও পবিত্রতার প্রতীক। রামলালার মুকুটে খোদিত হয়েছে ময়ূরের নকশাও। ময়ূর ভারতের জাতীয় পক্ষী। তাছাড়া ময়ূর রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে বিনম্রতার প্রতীকও। আর শৌর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হলো লালরঙের চুনি। রামলালার এই মুকুট তাই কেবল রাজকীয় পদমর্যাদার মস্তকাভরণ মাত্র নয়, ভগবান রামচন্দ্র তথা ভারত রাষ্ট্রের রাজকীয় তেজস্বিতার সঙ্গে বিনম্র সংস্কৃতিরও দ্যোতক।

ষোল গ্রাম খাঁটি সোনায় নির্মিত হয়েছে রামলালার কপালে সজ্জিত তিলক। এর মাঝখানে ৩ ক্যারেটের যে হীরকখণ্ড স্থাপন করা হয়েছে তা চারিদিকে ছোট ছোট হিরা দিয়ে ঘেরা। আর লম্বালম্বিভাবে বসানো হয়েছে চোখে পড়ার মতো বেশ বড় মাপের ব্রহ্মদেশীয় চুনি। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সিঁদুরের তিলক। এই তিলক বস্তুত রক্ষাকবচ। যা ধর্মানুসারী ও সদাচারীদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। মুকুট ও তিলকের মাঝখানে খচিত হিরা-মানিক এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে উদিত সূর্যের প্রথম রশ্মি তার উপরে প্রতিফলিত হয়। মূর্তির উচ্চতা তার কপাল পর্যন্ত ৫১ ইঞ্চি করা হয়েছে এই কারণেও।

গলায় ছোট ছোট হিরা খচিত চিকের মাঝখানে বসানো হয়েছে বেশ বড়ো এবং নজরকাড়া একখানা চুনি। যা ভগবান রামচন্দ্রের মন্দ্রমধুর কণ্ঠস্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্যামলা-কালো পাথরের বিগ্রহে সবচাইতে বড়ো ও লম্বা যে অলংকার সেটি হলো 'বিজয়মালা'। সত্যিই তো, কাঁধ থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত নিরেট সোনায় তৈরি এহেন বিজয়মালা জন্মভূমি মন্দিরে বিরাজমান রামলালা ব্যতিরেকে আর কার গলায় শোভা পেতে পারে! এই সুরম্য মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য রামলালার সঙ্কল্পে লড়াই তো কিছু কম হয়নি। ১৫২৮ সালে ভারতে বহিরাক্রমণকারী বাবরের ফরমানে তার অন্যতম প্রধান সেনাপতি মীর বাঁকি যেদিন কামানের গোলার আঘাতে সম্রাট বিক্রমাদিত্য নির্মিত রামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে তার উপরে মসজিদের কাঠামো খাড়া করেছিল সেদিন থেকে দীর্ঘ ৪৯৫ বছর ধরে তা পুনর্নির্মাণের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সংগ্রাম, আন্দোলন কোনো কিছু বাকি থাকেনি। ইতিহাস সাক্ষী, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ এজন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অগ্রণী ভূমিকায় এবং অশোক সিংঘলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শ্রীরামের জয়ধ্বনিতে চলে এসেছে অসমুদ্র-হিমাচলব্যাপী মুক্তি আন্দোলন। যে আন্দোলনকে সমগ্র ভারত তথা বিশ্ববাসী ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত করেছেন। শেষ পর্যন্ত সেই মহাসংগ্রামে জয়লাভের মাধ্যমে জন্মভূমি মন্দিরে পুনঃস্থাপিত হয়েছেন অযোধ্যার রাজপুত্র রামলালা। এই 'বিজয় মালা' বিজয়ীর গলায় ছাড়া আর কার গলায় শোভা পাবে! ২ কিলোগ্রাম খাঁটি সোনায় হিরা-মানিক বসিয়ে তৈরি হয়েছে আজানুলম্বিত এই হার। কেবল তাই নয়, হিন্দু পরম্পরাও রীতি অনুসরণ করে খচিত হয়েছে এই বিজয়মালার নকশা। তলায় আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসা হীরক খচিত সূর্যাকার লকেটে যে কারও চোখে আটকে যেতে বাধ্য।

কাঁধ থেকে ঝোলানো এই বিজয়মালার উপরের দিকে বিগ্রহের শোভা বর্ধন করছে সূর্যবংশের প্রতীক খচিত এবং নানা রত্ন সমণ্ডিত চওড়া চন্দ্রহার। এটি তৈরি করতে লেগেছে প্রায় সাড়ে পাঁচশো গ্রাম সোনা। তার নীচের রামলালার স্ফীত রক্ষ ও দুদিকের পাঁজর আবৃত করে রেখেছে 'পাচলা' বা পাঁচনরির হার। কাঁধের দুদিক থেকে নেমে আসা ছড়াগুলো যুক্ত হয়েছে মাঝখানে পান্না বসানো তিন-তিনটি লকেটে। আর সেখান থেকে প্রায় নাভিস্থল পর্যন্ত ঝুলছে পানপাতার আকারের বড়ো বড়ো দুটি লকেট। শেষ লকেটটির তলায় ঝুলছে ১৪টি ঝলমলে সবুজ পান্নার বুঁটি। শ্রীরামচন্দ্রের ১৪ বছর বনবাসকালে দণ্ডকারণ্যের ঘন সবুজ শ্যামলিমার অনুসরণে আফ্রিকা মহাদেশের জাম্বিয়া থেকে আনা সারা বিশ্বের সবচাইতে সেরা মানের পান্না দিয়ে সাজানো হয়েছে এই পাঁচলা। সোনালি রোদে গভীর অরণ্যের ঘন সবুজ যেমন নয়ন মুগ্ধ করে, ঝলমলে স্বর্ণালংকারের ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে সবুজ পান্নার এই মেলবন্ধনও যেন তেমনিভাবে মুগ্ধ করেছে আকৃতিভরা দু'চোখে চেয়ে থাকা দর্শনার্থীদের। ছোটো ছোটো হিরের টুকরো দিয়ে গাথা এই পাঁচলা তৈরি করতে লেগেছে সাড়ে তিনশো গ্রাম সোনা।

এখানেই শেষ নয়। রামলালার নয়ন মনোহর বিগ্রহের কোমরে পরানো হয়েছে প্রায় ২ ইঞ্চি চওড়া কোমরবন্ধ। যার দু'পাশে রয়েছে হীরকখণ্ড এবং মাঝখানে সবুজ পান্না। ৪০০ গ্রাম সোনার ওপর রত্নখচিত এই কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে হিরা-চুনি-পান্না এবং খাঁটি মুক্তোর মটরমালা ঘেরা চাঁদমালার মতো তিন-তিনটে ঝালর। দু' পাশের দুটি ঝালরকে বেষ্টন করে রেখেছে চুনির মালা। মাঝের ঝালরকে বেষ্টন করেছে পান্না।

বিগ্রহ তো নয়, সূর্যবংশের ৬১ তম বালক

রাজপুত্র। তাঁর মায়াময় রাজকীয় অঙ্গাভরণে বাজুবন্ধ (আর্মলেট) থাকবে না, আঙুলে আংটি, কানে কুণ্ডলাদি থাকবে না তা কি হয়! দুই বাহুতে যেমন খাঁটি এবং নিরেট সোনার বাজুবন্ধ আছে তেমনি দুহাতের কবজিতেও রয়েছে নিরেট সোনার কঙ্কন। যার এক একটির ওজন ৪২৫ গ্রামের বেশি। বলাবাহুল্য সবগুলোই রত্নখচিত। বাউটি বা চুড়ের মতো কঙ্কনগুলোর প্রত্যেকটিতে বসানো হয়েছে ১০০ ক্যারেট হিরা এবং ৩২০ ক্যারেট চুনি-পান্না। রামলালার দু'হাতের মুঠোয় ধরা ধনুর্বাণ। তাই দু' হাতের আঙুলগুলোও তেমনি মানানসই। দুই অনামিকার শোভাবর্ধন করছে রত্নখচিত দুটি আংটি। এক-একটি তৈরি হয়েছে ২৬ গ্রাম করে সোনা দিয়ে। ডান অনামিকার আংটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে জাম্বিয়ান পান্না আর বাঁ অনামিকার আংটির মাঝখানে শোভা পাচ্ছে ব্রহ্মদেশীয় চুনি।

দুরাত্মা-আশ্রিত দুর্জন-দুষ্কৃতী বিনাশকারী ভগবান বিষ্ণু যুগে যুগে অবতাররূপে ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় দশরথ নন্দন রামচন্দ্র মহামেধা, মহাবলবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে অনেক ছোটোবেলা থেকেই ধনুর্বাণধারী। পরস্ত্রী হরণকারী দুরাত্মা বালী এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ছাড়াও মহর্ষিদের মতো সাধুসন্ত ও সুজনদের সাধন ভজনে তাণ্ডব সৃষ্টিকারী তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছেন বস্তুত তাঁর বাল্যাকালেই। এমন একজন আবাল্য শূরবীরের হাতে যে ধনুর্বাণ থাকবে সেকথা বলাই বাহুল্য। অযোধ্যার পুনর্নির্মিত রামজন্মভূমি মন্দিরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত রামলালার বিগ্রহের বাঁ হাতে ধৃত রয়েছে আভূমি লম্বিত ধনুক আর ডান হাতে রয়েছে বাণ বা তির। এই দুই প্রতীকী শস্ত্রও মনোরমভাবে কারুখচিত এবং ২৪ ক্যারেট বা খাঁটি সোনার যা গড়তে লেগেছে ১ কিলোগ্রামের কিছু বেশি। সব মিলিয়ে রামলালার শ্যামল অঙ্গে শোভাবর্ধন করছে দেড় ডজনেরও বেশি রত্নালংকার।

স্বভাবতই কৌতূহল জাগে যে বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসাবে হল মার্ক এবং আই জি আই-এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থার শংসাপত্র প্রাপ্ত সোনা এবং হিরা-চুনি-পান্নার মতো অতি মূল্যবান রত্ন সামগ্রী সব এল কোথা থেকে! রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টই এ সমস্ত তৈরি করিয়েছে নাকি কেউ বা কারা দান করেছেন এত সব দুর্মূল্য উপহার সামগ্রী! আর কারাই-বা নির্মাণ করেছেন দৃষ্টিনন্দন এই অলংকাররাজি! এই সমস্ত অলংকার যাঁরা তৈরি করে দিয়েছেন তাঁদের কথায় আগে আসি।

যাঁরা কয়েক কোটি টাকার এই সোনা ও রত্ন উপহার দিয়েছেন তাঁরা কিন্তু সেকথা একবারের জন্যও প্রচার করেননি। বহু প্রতিক্ষিত রামজন্মভূমি মন্দির এবং সেখানে বিরাজমান রামলালার বিগ্রহের জন্য এত সমস্ত উপহার তাঁদের ভক্তির অর্ঘ্য হিসাবে দান করে যেন নিজেরাই কৃতার্থ বোধ করছেন।

অযোধ্যার রাজপুত্রের উপযুক্ত এই সমস্ত অলংকার গড়ে দিয়েছেন লখনউয়ের 'হর্ষহাইমল শিয়ামলাল (উচ্চারণ ভেদে শ্যামলাল) জুয়েলার্স (এইচ এস জে)। কারুকার্যখচিত নয়ন মনোহর অলংকার তৈরিতে এই প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ১৩০ বছরের এই প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষ ছাড়াও বৃন্দাবনের বাঁকেবিহারী (শ্রীকৃষ্ণ) এবং আরও অনেক মন্দিরের বিগ্রহের জন্য বিশেষ ধরনের অলংকার তৈরি করেছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের বরেলি, বদায়ুন ও আলিগড়ের অনেক মন্দিরের জন্য।

এবারে আসি সোনা-রত্নের কথায়। রামলালার রত্নালংকার এবং রামজন্মভূমি মন্দিরের গর্ভগৃহের ৪ পাল্লার দরজা-সহ মোট ৪২টি দরজা সোনার পাতে মুড়ে দেবার জন্য ভক্তির অর্ঘ্য হিসাবে ১২১ কিলোগ্রাম সোনা দান করেছেন গুজরাট প্রদেশের সুরাটের ব্যবসায়ীরা। যাঁদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়েরও অনেকে আছেন। উল্লেখিত ব্যবসায়ীদের প্রধান ব্যবসা হলো হিরা-চুনি-পান্না কাটাই এবং ক্রয়-বিক্রয় করা। প্রায় সওয়া কুইন্টাল খাঁটি সোনা ছাড়াও উল্লেখিত হিরা-মানিকও তাঁরাই দান করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারা গেছে। অথচ উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, যাঁরা কয়েক কোটি টাকার এই সোনা ও রত্ন উপহার দিয়েছেন তাঁরা কিন্তু সেকথা একবারের জন্যও প্রচার করেননি। বহু প্রতিক্ষিত রামজন্মভূমি মন্দির এবং সেখানে বিরাজমান রামলালার বিগ্রহের জন্য এত সমস্ত উপহার তাঁদের ভক্তির অর্ঘ্য হিসাবে দান করে যেন নিজেরাই কৃতার্থ বোধ করছেন।

রামলালার বিগ্রহের জন্য তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই সমগ্র ভারত ছাড়াও বিশ্বের অন্তত ৫৬টি দেশ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য তথা দানসামগ্রী আসা শুরু হয়েছে যা এখনও অব্যাহত। রামলালার জন্য রক্ষিত দান ভাণ্ডার ইতিমধ্যেই উপচে পড়েছে। অনেক আগে থেকেই 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা। এসেছে এবং আসছে নানা বৈচিত্র্যময় উপহারও। রামলালার প্রতি ভক্তিজাত বৈচিত্র্য কত যে বিচিত্র হতে পারে তার কিছু বিবরণ বারান্তরে হয়তো তুলে ধরা যাবে। কিন্তু যে প্রশ্ন অনেকের মনেই উঠতে পারে তাহলো, দুর্মূল্য ও বৈচিত্র্যময় শ্রদ্ধার্ঘ্য, উপহার সামগ্রী নিবেদনকারীরা কোন ধনে ধনী হয়ে এইভাবে প্রায় সর্বস্ব অর্পণ করে চলেছেন! বদলে কী পাচ্ছেন তাঁরা! যাঁদের কাছেই জানতে চেয়েছি সকলেই নিজের মতো করে যা বলতে চেয়েছেন তার সারাৎসার একটাই—'পায়ো জী ম্যাঁয়নে, রাম রতন ধন পায়ো...।' পেয়েছি, আমি রাম রতন ধন পেয়েছি। মহীশূরের যোগীরাজও হয়তো এই ধনে ধনী হয়েই তাঁর নিজের সৃষ্টিকে নিজে চিনতে পারেননি। □

সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ, গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত

দিগন্ত চক্রবর্তী

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত্রে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকলো পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশবাসী। সন্দেশখালির মা-বোনেদের উপর শাসকদলের নেতাদের অকথ্য অত্যাচার, নারীদের সম্মানহানির ঘটনায় যখন একপ্রকার তোলপাড় গোটা দেশ, তখন এই সম্পর্কিত বিষয়ে রিপোর্টিং করায় গ্রেপ্তার করা হলো এক সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের তরুণ সাংবাদিক সন্তু পানকে।

রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পানকে কর্তব্যরত অবস্থায় গ্রেপ্তার করছে পুলিশ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'ভারতের জননীই আদর্শ নারী'। এই মাতৃস্বরূপা নারীজাতি, ভারতবর্ষ যাদের চিরকাল দেবী হিসেবে পূজা করা হয়েছে তাদের উপরেই অকথ্য অত্যাচার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালিতে। এই ঘটনাগুলিকে সারাদেশের মানুষের সামনে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বিভিন্ন সংবাদপত্র তথা সংবাদমাধ্যমগুলি। সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আর এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্যই হয়তো সাংবাদিকদের উপর এই আক্রোশ। তাইতো যে পুলিশ এতদিন ধরে শাজাহানের মতো অত্যাচারী, মা-বোনদের মর্যাদাহরণকারী নরপিশাচকে ধরতে ব্যর্থ, সেই রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করছেন সন্তু পানের মতো সাংবাদিককে, মা-বোনেদের সুরক্ষার দাবিতে সওয়াল হয়েছেন। যার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে সন্দেশখালির সেই সব অসহায়, অভাগা মা-বোনেদের করুণ স্বর। মা-বোনেদের সুরক্ষা দিতে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হওয়া রাজ্য পুলিশ এখন চাইছে ঘটনাগুলিকে ধামাচাপা দিতে। সেই জন্যই তাদের এই অতি সক্রিয়তা। নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয়, অন্যায়ের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে, তাদের মুখবন্ধ করতে উদ্যত রাজ্য পুলিশ। তাইতো পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকদের থাকতে হয় জেলের ভিতর আর শাজাহানের মতো কুখ্যাত অপরাধীরা থাকে জেলের বাইরে।

তবে এইভাবে কি সন্দেশখালির ঘটনার কোনও সুরাহা হবে? কিংবা এভাবে কি সন্দেশখালির ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পারবে রাজ্য সরকার? আসুন, দেখি ইতিহাস কী বলছে। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখব, এর আগেও যারা সংবাদমাধ্যমের অধিকার খর্ব করে বিভিন্ন ঘটনা মানুষের চোখের অন্তরালে রাখতে চেয়েছেন তাদের কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ ইন্দিরা গান্ধী সরকারের কথা ধরা যেতে পারে।

আজ থেকে প্রায় বছর পঞ্চাশের আগের কথা। দিনটা ছিল ২৫ জুন, ১৯৭৫। সেই দিনই ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ কেন্দ্রে শাসনাধীন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধী কংগ্রেস সরকারের সুপারিশে সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। সেই সময়ে সংবাদমাধ্যমকে যেন নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল গান্ধী পরিবার। খবরের কাগজে কী কী রাজনৈতিক খবর ছাপা হবে, কী হবে না— সবই নিয়ন্ত্রণ করতেন ইন্দিরা পুত্র সঞ্জয় গান্ধী। সংবাদমাধ্যমের ওপর জারি করা হয়েছিল সেন্সরশিপ। যেসব তথ্য বেঁধে দেওয়া হতো, তার বাইরে কিছু লেখার অধিকার ছিল না

সাংবাদিকদের। সংবাদপত্রের সম্পাদকদের নির্দেশ দেওয়া হয় দশ পাতার বেশি সংবাদপত্র প্রকাশ করা যাবে না। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল নিউজপ্রিন্টের ঘাটতি। তাছাড়া তখন সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, সারা দেশের মোট জনগণের মাত্র ১.৫ শতাংশ মানুষ খবরের কাগজগুলির ক্রেতা ছিলেন। এইসব কারণ দেখিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সংবাদপত্রের ওপর আরোপ আনলেও, এই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে এনেছিল তার স্বৈরাচারী মানসিকতাকে। তার স্বৈরাচারী মানসিকতার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭৬-এর প্রথম দিকে এজেন্স ফ্রান্স প্রেসকে দেওয়া তার একটি সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি সেন্সরশিপের পক্ষেই মতামত প্রকাশ করেন। রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখার সময়ে তিনি বলেন, 'Once there were no newspapers, there was no agitation. The agitation was in the pages of the newspapers. If you ask why there is censorshpip of the press, this is reason why.' (তথ্যসূত্র : Gandhi, Era of Discipline, p. 37) অর্থাৎ তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন সংবাদপত্র ছিল না তখন কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না। উৎকণ্ঠা তৈরি হয় সংবাদপত্রের পাতা থেকেই। এবং তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন এই কারণেই তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করেছেন। একটু ভেবে দেখুন তো, সেই সময়ের ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যের সঙ্গে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা কি খুব বেশি কিছু পার্থক্য রয়েছে? ইন্দিরা গান্ধী বর্ণিত এই উৎকণ্ঠার ভুক্তভোগী যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে, তাইতো তিনি খবরের চ্যানেল না দেখে সিরিয়াল দেখার নিদান দেন রাজ্যবাসীকে। বাংলায় একটা খুব প্রচলিত প্রবাদ আছে 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে অবস্থান বর্তমানে ঠিক এরকমই। সরকারের ব্যর্থতা তথা নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে সংবাদমাধ্যমগুলির সংবাদ পরিবেশনে ক্ষিপ্ত শাসকদলের রোষানল যেভাবে সংবাদমাধ্যমগুলির ওপর নেমে আসছে, এমনকী অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেশখালিতে তৈরি হওয়া এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্য সরকার যেভাবে সংবাদমাধ্যমকে দোষারোপ করছে তাতে করে এই অতি প্রচলিত প্রবাদ বেশ যুক্তিযুক্ত।

১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থাকালে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এবং আজকের পশ্চিমবঙ্গের কি বিশেষ কোনো পার্থক্য রয়েছে? সেই সময়ে জরুরি অবস্থাকালে সরকার প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল রাজধানীর বড়ো বড়ো সংবাদ সংস্থার ছাপাখানাগুলির বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া। যে কয়েকটি সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যম সরকারের পক্ষে খবর প্রকাশ করত শুধুমাত্র তাদেরই সরকার খবর ছাপার অনুমতি দিয়েছিল। বেশিরভাগ সাংবাদিক, সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, কর্মীদের আটক করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থাকালে মানুষের বিদ্রোহ, আন্দোলন যুব কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রাজ্যগুলির ক্ষমতার ওপর জোর করে নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাস্ফীতি; উত্তর পূর্ব ভারতের মানুষের দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহ, আন্দোলন ইত্যাদি খবরগুলি প্রকাশের ওপর ছিল কড়া সরকারি নিষেধাজ্ঞা।

সরকারের অতি বিরোধী পত্রিকাগুলি যেমন রাজমোহন গান্ধীর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিম্মত', তামিলনাড়ুর পাক্ষিক পত্রিকা 'তুঘলক', প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত কাগজ 'মেইনস্ট্রিম'— সেন্সরশিপের আওতায় আনা হয়েছিল। সেই সময়ের মতো আজকের এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছি কীভাবে হরণ করা হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। কীভাবে জোর করে ভয় দেখিয়ে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখা হচ্ছে তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই।

জরুরি অবস্থার সময়ে মানুষের করুণ কাহিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরার জন্য 'মাদারল্যান্ড'-এর সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক কে. আর. মালকানি এবং হিন্দ সমাচারের কর্ণধার লালা জগৎ নারায়ণকে জরুরি অবস্থার পুরো একুশ মাসই কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মালকানি লিখেছেন, 'Motherland was the only newspaper in the country which in its edition published on June 26 not only informed people about emergency but also about arrest and protest at national level against emergency.' তিনি আরও লিখেছেন যে ঝাঁসি রোড, ঝাণ্ডেওয়ালা, নয়াদিল্লিতে অবস্থিত 'মাদারল্যান্ড'-এর অফিসের বিদ্যুৎ কেটে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু পাশেই অবস্থিত 'জনযুগ' পত্রিকার অফিসে বিদ্যুৎ ছিল। (তথ্যসূত্র : K.R.Malkani, The midnight Knock, p. 1)

এক্ষেত্রেও মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা সংবাদমাধ্যমগুলির ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠছে রাজ্য সরকার তথা শাসকদলের আক্রোশ। তাইতো অপরাধীদের সাজা দিতে ব্যর্থ হওয়া রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে কর্তব্যরত এক সাংবাদিককে। আসলে এক্ষেত্রে একজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করলেও এর মাধ্যমে সমস্ত সাংবাদিকদেরই এক পরোক্ষ বার্তা দিতে চাইছে তারা। তারা বোঝাতে চাইছেন যে সরকারবিরোধী পদক্ষেপ নিলে তাদের অবস্থাও হয়তো এরকমই হবে, তাদের হয়তো এভাবে গ্রেপ্তার হতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী সংবাদমাধ্যম হলো গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সংবাদমাধ্যমের যথাযোগ্য ভূমিকা ছাড়া পূর্ণ রূপ পায় না গণতন্ত্র। সাংবাদিকদের কর্তব্য সরকারের পদলেহন নয় বরং মানুষের দাবি তুলে ধরা। সেই কাজট সঠিকভাবে করার জন্য মিথে অভিযোগে ফাঁসিয়ে তাকে কর্তব্যরত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হলো।

এতকিছু খারাপের মধ্যেও আশা জোগাচ্ছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কবিতা সংকলনের এক বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি,

'দামামা ওই বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নতুন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয়,
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়ের টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।' □

জ্বলছে সন্দেশখালি, রাজ্য থেকে পালাবার ছক কষছে কি তৃণমূল কংগ্রেস ?

জাহ্নবী রায়

উত্তর ২৪ পরগনার একের পর এক গ্রামে জনরোষের যে ছবি আজ সারা দেশ সমেত বিশ্ব দেখছে, সেটা কী খুব সুখের বা আনন্দের? একথা বলার কারণ একটাই, রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার ওপর আর বিশ্বাস করতে পারছে না সাধারণ গ্রামের মানুষ। আর তার প্রতিফলনের সূত্রপাত সন্দেশখালি। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার কোনো নিয়ন্ত্রণ এই মুহূর্তে উত্তর ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত ওই গ্রামগুলিতে নেই। স্বয়ং রাজ্য পুলিশের ডিজি হাজির হয়েও সামাল দিতে পারেননি ক্ষোভের আগুন। রাস্তায় গুঁড়ি ফেলে, আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভের রেষ ছড়িয়ে পড়েছে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। এদিকে রাজ্যের শাসক দল এর পিছনে বিরোধীদের উস্কানির গন্ধ শুঁকে বের করার চেষ্টা করছে। তারা এটা বোঝার চেষ্টা করছেন না যে, সারা রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শেখ শাজাহানের মতো আরও বহু শাজাহান তাদের দল তৈরি করে সন্দেশখালির মতো অপরাধের এক আদর্শ ক্ষেত্র বানিয়ে, লুঠ করে চলছে সাধারণ মানুষের জমি থেকে সম্ভ্রম। আর শাসক দলের অনুপ্রেরণায় দুষ্কৃতীরাজ কায়েম করে চলেছে। এই বাড়াবাড়ি এখন চরম পর্যায়ে।

শাসক দলের নীচু স্তরেও ক্ষোভ যে বাড়ছে না, তা নয়। ইতিমধ্যেই সেই বিষয় নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্ব উদ্বিগ্ন। রাজনৈতিক মহলের একটি সূত্র বলছে, এই ক্ষোভ মমতাপন্থীদের সঙ্গে অভিষেকপন্থীদের যে বিবাদ, সেটা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। অভিষেকপন্থীদের মুখে কুলুপ, অন্যদিকে মমতাপন্থীদেরও মুখে কুলুপ। আরও একটি মহল বলছে, যে পাপ মমতা সরকার করেছে, তা মেটানোর ক্ষমতা শাসক দলের নেই। শাসক দলের জনপ্রিয়তা একেবারেই তলানিতে। ফলে সারা রাজ্যে, একটা অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করে, রাজ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে যে করেই হোক ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা লাগু হওয়ার বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। আর যখনই এই ধারা লাগু হবে, সেই সেন্টিমেন্টের ওপর ভর করে এই শাসকদল নির্বাচনী বৈতরণী পেরিয়ে যাবার কৌশল করবে। হার বা জিত যাই হোক, রাজ্যের তৃণমূল অন্তত বাঁচবে, মুখ রক্ষা হবে— এটাই তারা আশা করছে।

সন্দেশখালির বেড়মজুরের ঘটনার দিকে বা ঝুপখালির দিকে তাকালে নন্দীগ্রামের ছবি পরিষ্কার মনে করিয়ে দেবে। গ্রামবাসীদের ওপর পুলিশি জোরজুলুম, সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরপাকড় আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে পরিবেশ। রাস্তায় কাঠের গুঁড়ি, আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে পুলিশকে আটকানোর চেষ্টা। এখানেও সেই জমির আন্দোলন। সেবারে ছিল সরকারের তরফে জমি অধিগ্রহণ, এবার শাসক দলের বাহুবলীদের জমি দখল। সঙ্গে জুড়েছে বঞ্চনা ও অত্যাচার। এর জন্য যদি কাউকে দায়ী করতেই হয়, তাহলে তা হলো রাজ্যে প্রশাসন ও পুলিশের একমুখী অ্যাকশন। দেশের রক্ষক যখন অত্যাচারীর ভূমিকায় নিজেকে নামিয়ে ফেলে, সেই সময় সাধারণ মানুষের মনে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে। মহিলারা রাস্তায় নেমেছেন ঝাঁটা ও লাঠি নিয়ে। প্রশাসনও এইসব মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে নেমেছে কোমর বেঁধে। সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, শাজাহানকে পুলিশ বাহিনী কার ভয়ে, কী কারণে এখনও ধরেনি? অন্য দিকে তাঁদের জিজ্ঞাসা, বেড়মজুরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা কেন পরীক্ষা দিতে পারল না, কেনই-বা দিন মজুর ঘরের ছাত্রদের, সাধারণ পুরুষদের তুলে নিয়ে গেল পুলিশ? এইসব প্রশ্নের জবাব চাইছে আজ প্রশাসনের হাতে নির্যাতিত, নিগৃহীত আমজনতা।

এদিকে রাজ্য পুলিশের সর্বময় কর্তা রাজীব কুমার কেন সন্দেশখালি গেলেন, কেনই-বা মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন, সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে উনি হয়তো প্রমাণকে ধামা চাপা দিতে গিয়েছেন। সন্দেশখালিতে যা ঘটছে, সেই ঘটনা যাতে বাইরে না আসে, সেটা ধামা চাপা দিতে চাইছেন। আবার একপক্ষ মনে করছে ১৪৪ ধারার নামে অলিখিত জরুরি অবস্থা কায়েম করেছে মমতা সরকার। তাই জায়গায় জায়গায় এই ধারা জারি করছে পুলিশ।

এদিকে রাজ্য প্রশাসনের একেবারে আগ্রাসী মনোভাব— সন্দেশখালি থেকে সারা রাজ্যে শাসক বিরোধী হাওয়াকে একটি ঝড়ে পরিণত করেছে। সেই ঝড় এই মুহূর্তে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা এই রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর যে নেই, সেটাও প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। অন্য দিকে রাজ্যের শাসক দলের কর্মীরা যে এখন দিশেহারা, সেটাও প্রমাণিত হয়ে পড়ছে বারেবারে। ফলে একেবারেই রাজ্যের শাসক দল বল্গাহীন এক হিংস্র পশুর চেহারায়, সেটা দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে।

সবশেষে বলতে হচ্ছে, জমি আন্দোলন থেকে উঠে আসা রাজ্যের বর্তমান শাসক দল শেষ হবে জমি রক্ষার আন্দোলনেই।

লাতুরে বিবেকানন্দ ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২০ ফেব্রুয়ারি মহারাষ্ট্রের লাতুরে বিবেকানন্দ মেডিক্যাল ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার পরিচালিত বিবেকানন্দ ক্যান্সার অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি এক্সটেনশন হাসপাতালের উদ্বোধন ও লোকার্পণ করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডব্য। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত, মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্দেশক ডাঃ রাজেন্দ্র বড়ওয়ে, সঙ্ঘের দেবগিরি প্রান্ত সঙ্ঘচালক অনিলজী ভালেরাও, বিবেকানন্দ হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাঃ অনিল অন্ধুরকর, বৈদ্যকীয় নির্দেশক অরুণাতাই দেওধর ও ডাঃ ব্রিজমোহন ঝাওয়ার।

২০১৫ সালে বিবেকানন্দ ক্যান্সার হাসপাতালের উদ্‌ঘাটন করেছিলেন মহারাষ্ট্রের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। ২০১৮ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডার উপস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ে, যৌথ আর্থিক সহযোগিতায় হাসপাতালটিকে টার্শিয়ারি ক্যান্সার কেয়ার সেন্টারে উন্নীত করার প্রকল্পটি ঘোষিত হয়। এর ফলে এক ছাতার নীচে তিন রকমের ক্যান্সার চিকিৎসা পরিষেবা, অর্থাৎ কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ও সার্জারির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। হাসপাতালের লোকার্পণ অনুষ্ঠানের পর পুরো প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ মাণ্ডব্য। পদ্মভূষণ ডাঃ অশোকজী কুকড়ের লেখা 'ধ্যেয় সাধনেচে সাঙ্গাতী'— বইটিও তাঁরা প্রকাশ করেন।

খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে ছাত্রের রিস্টব্যান্ড বাজেয়াপ্ত করায় প্রতিবাদ বজরং দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ত্রিপুরায় আগরতলার দুর্জয়নগরে খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত হোলি ক্রস স্কুলে অষ্টম শ্রেণীকে পাঠরত একটি ছাত্রের হাতের মণিবন্ধে পরিহিত, ওঁ চিহ্ন সংবলিত একটি রিস্টব্যান্ড এই স্কুলের একজন শিক্ষিকা খুলে নেন। ছাত্রের বাবা ড. মনোজ নাথ আগরতলা উইমেন্স কলেজের অধ্যাপক। তিনি জানান যে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির থেকে রিস্টব্যান্ডটি তাঁর দাদা সংগ্রহ করেছিলেন। ওই স্কুলে তাঁর ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে এখনও পর্যন্ত ৬ বছর ধরে পাঠরত। ওই শিক্ষিকা তাঁর ছেলেকে রিস্টব্যান্ড পরিধানে বাধাদান ছাড়াও রিস্টব্যান্ডটি ওর হাত থেকে খুলেও নেন। এর আগেও ওই সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন শিক্ষিকা অন্য ছাত্রদেরও ধর্মীয় চিহ্ন সংবলিত সামগ্রী পরিধানে বাধাদান করেন। তাঁর পুত্র তাঁকে ঘটনাটি জানালে স্কুলের প্রিন্সিপালকে তিনি ফোনে বিষয়টি জানান। প্রিন্সিপাল তাঁকে ভাইস-প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে বলেন। সেই অনুযায়ী গত ২০ ফেব্রুয়ারি ছাত্রটির অভিভাবক ও বজরং দলের কয়েক জন কার্যকর্তা ভাইস-প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানান। ভাইস-প্রিন্সিপাল তাদের দাবি মেনে নেন এবং তারপর ওই শিক্ষিকা ছাত্রটিকে তার রিস্টব্যান্ডটি ফিরিয়ে দেন। বজরং দলের একজন কার্যকর্তা জানান যে খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলিতে এইভাবে কিশোর ছাত্রদের ওপর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রবণতা জারি রয়েছে, যা তাদের মানসিক বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই ছাত্রটির রিস্টব্যান্ডটি বাজেয়াপ্ত করা কেবলমাত্র ছাত্রটির ধর্ম বিশ্বাসের ওপর নয়, হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি, পরম্পরা, ধর্মীয় অনুভূতি, আস্থা ও দেশের সংবিধান প্রদত্ত অধিকারের ওপর আঘাত। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে হোলি ক্রস স্কুলের অন্য একটি ক্যাম্পাসে ২০১৯ সালে জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত নবম শ্রেণীর একটি ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল ও হোস্টেল ওয়ার্ডেন গ্রেপ্তার হন।

প্রয়াত সংবিধান বিশেষজ্ঞ ফলি এস নরিম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ৯৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সুপ্রিম কোর্টের অভিজ্ঞ আইনজীবী ও বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ফলি স্যাম নরিম্যান। ২১ তারিখ সকালে দিল্লিতে নিজের বাসভবনে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে আইনজীবী ও রাজনৈতিক মহল। তাঁদের মতে, ফলি এস নরিম্যানের মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান হলো। শুধুমাত্র অভিজ্ঞ আইনজীবী হিসেবেই নন, সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন ফলি নরিম্যান। সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ দিন প্র্যাকটিস করেছেন। তবে যাত্রা শুরু ১৯৫০ সালে বম্বে হাইকোর্ট থেকে। দীর্ঘ ৭০ বছর আইনি পেশায় যুক্ত ছিলেন। ১৯৭২ সালের মে মাসে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেলও নিযুক্ত হন। সেই সময়ই মুম্বই থেকে দিল্লিতে আসেন।

১৯২৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন বার্মার রেঙ্গুনে জন্ম ফলি নরিম্যানের। ১৯৭৫ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে ফলি নরিম্যান অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেলের পদ থেকে ইস্তফা দেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজিয়াম পদ্ধতির অন্যতম স্রষ্টাও বলা হয় তাঁকে। ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করতেও আইনি লড়াইতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯১ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মান লাভ করেন ফলি নরিম্যান। ২০০৭ সালে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৯১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ আর্বিট্রেশনের ভাইস চেয়ারম্যানও ছিলেন ফলি নরিম্যান।

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত জেনিভায় ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জ্যুরিস্টের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যানও নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্পষ্টবক্তা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন নরিম্যান। ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার পক্ষে ছিলেন। ভারতীয় সংবিধান, আইন নিয়ে বইও লেখেন তিনি। ১৯৯২ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মানদানের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় তিনি ছিলেন নেতাজী অনুগামীদের পক্ষের আইনজীবী। নেতাজী মৃত তা সর্বোচ্চ আদালতে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং এই মামলায় নেতাজী অনুগামীদের জয় হয়। এই মামলায় তাঁর অবদান তাই অনস্বীকার্য। তাঁর পুত্র রোহিন্টন ফলি নরিম্যান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত।

মানুষের সেবা করা হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা করা

আধ্যাত্মিক সিদ্ধজ্যোতিষ

গৃহশান্তি, মনোবাঞ্ছনা পূর্ণার্থে
সৌভাগ্যলাভ ও যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য
বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রীয় মধুবিদ্যার দ্বারা অব্যর্থ প্রতিকার করা হয়

বিদগ্ধ ইষ্টসিদ্ধ ও বিবাহ বিশেষজ্ঞ জ্যোতিষী
অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ
(জ্ঞানই ধর্ম, কর্ম ও শক্তি)

গ্রাম ও পোঃ-দেউলটি, জেলা- হাওড়া-৭১১৩০৩ চেম্বার - রামরাজাতলা
Mobile & Whats app : (+91) 9046205790

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা